বাংলাদেশের পোশাকশিল্পে ত্রিপক্ষীয়তার অবস্থা এবং সমন্বয়পুর্ণ শিল্প ও শ্রম সম্পর্কের সুযোগ

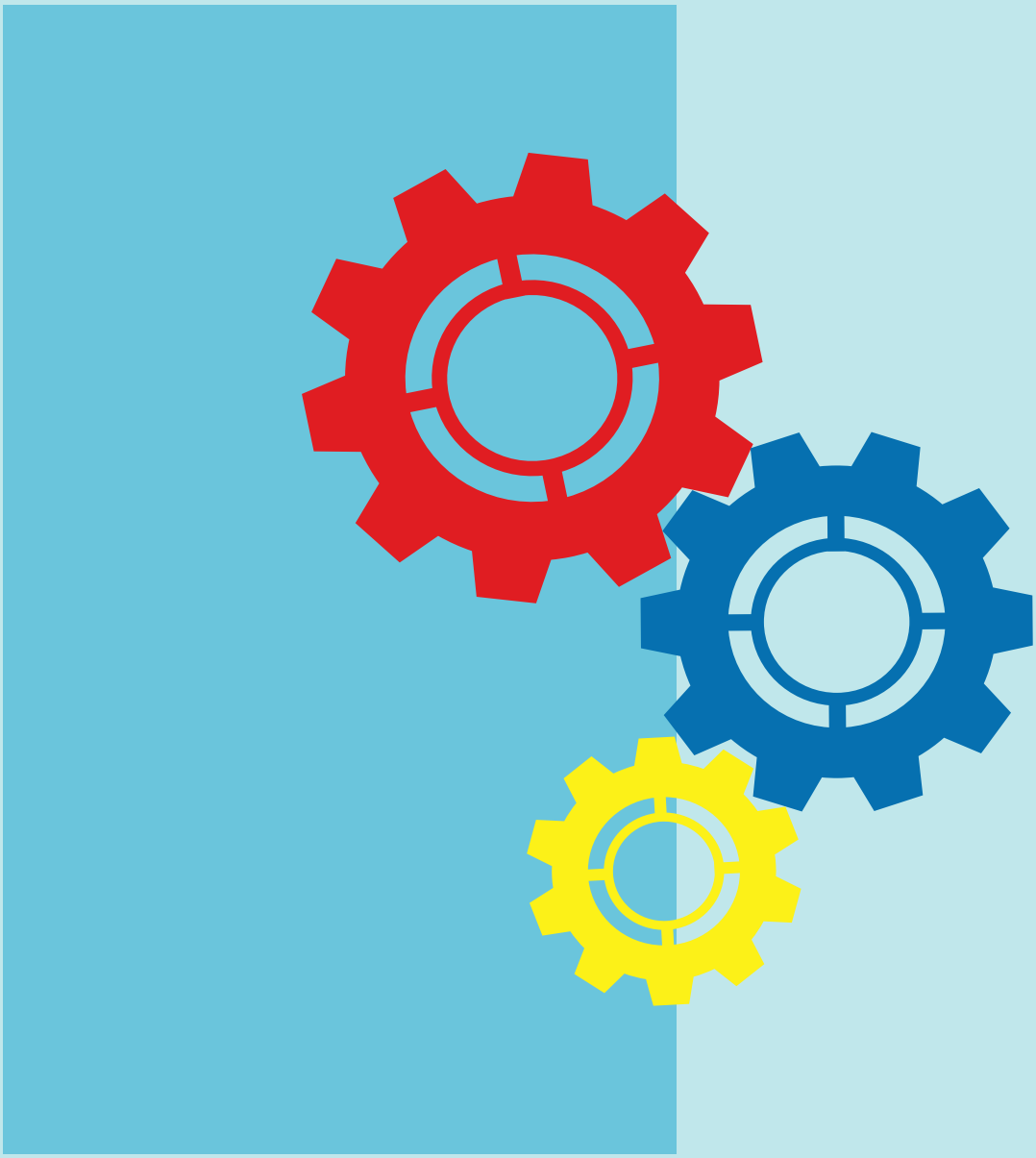

FRIEDRICH EBERT STIFTUNG এফ ই এস

BILS বিল্‌স

বাংলাদেশের পোশাকশিল্পে ত্রিপক্ষীয়তার অবস্থা এবং সমন্বয়পুর্ণ শিল্প ও শ্রম সম্পর্কের সুযোগ

FRIEDRICH EBERT STIFTUNG এফ ই এস

BILS বিল্‌স

বাংলাদেশের পোশাকশিল্পে ত্রিপক্ষীয়তার অবস্থা এবং সমন্বয়পুর্ণ শিল্প ও শ্রম সম্পর্কের সুযোগ

সার্বিক নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধান
মোঃ হাবিবুর রহমান সিরাজ, চেয়ারম্যান, বিল্‌স
নজরুল ইসলাম খান, মহাসচিব, বিল্‌স

লেখক
জাকির হোসেন
আফরোজা আক্তার

বিল্‌স গবেষণা উপদেষ্টা টিম
শাহ মোঃ আবু জাফর (চেয়ারম্যান)
মোঃ জাফরুল হাসান
আব্দুল মুকিত খান
মোঃ আলাউদ্দিন মিয়া (সদস্য সচিব)

গবেষণা উপদেষ্টা ও সমন্বয়
রায় রমেশ চন্দ্র
মোঃ জাফরুল হাসান
সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ
নাজমা ইয়াসমিন

অনুবাদ
রোকেয়া রহমান

প্রকাশনা তত্ত্বাবধান
মোঃ ইউসুফ আল-মামুন

সার্বিক সহযোগিতায়
ফারিবা তাবাসসুম ও মামুন অর রশীদ

প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর, ২০১৭

ISBN: 978-984-34-1100-6

কপিরাইট: বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স এবং ফ্রেডরিক-ইবার্ট-স্টিফটুং (এফইএস) বিল্‌স এবং এফইএস এর লিখিত অনুমতি ছাড়া প্রকাশনার কোন অংশ বানিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না।

মুখবন্ধ

বিপুল জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ও রপ্তানিতে (মোট রপ্তানির ৮০ শতাংশেরও বেশি) তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখার মাধ্যমে তৈরি পোশাক খাত (আরএমজি) বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ জীবনরেখায় পরিণত হয়েছে। সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য অংশের, বিশেষ করে গ্রামীণ যুবনারীদের সামাজিক রূপান্তরে এই খাত ব্যাপক অবদান রেখে চলেছে। একই সঙ্গে, এটাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে পোশাক শ্রমিকেরা ত্যাগ ও আন্তরিক অঙ্গীকারের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিকে প্রতিযোগিতামূলক ও সহায়তা করার লক্ষ্যে এ খাতের মূল শক্তি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে। দুর্ভাগ্যবশত, কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতির অভাবসহ অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা এবং শিল্প সম্পর্ক ও মৌলিক শ্রম অধিকার বিষয়ক সীমাবদ্ধতার ফলে পোশাক শ্রমিক ও শিল্প উভয়ই আজ দুর্ভোগের শিকার। এর ফলে শ্রম বিরোধের সৃষ্টি হয়।

এই গবেষণায় পোশাক খাতের শ্রমিকদের সঙ্গে মালিকদের বিরোধের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। যেহেতু বিশেষভাবে কারখানাগুলোয় এবং সাধারণভাবে পোশাক খাতে কোনো কার্যকর সামাজিক মতবিনিময় পদ্ধতি নেই, সেহেতু এই গবেষণায় বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধ মীমাংসার জন্য প্রতিনিধিত্বের নানা ধরনের (মোডালিটিজ) ছক আঁকা হয়েছে। এই গবেষণায় সবগুলো বিদ্যমান ত্রিপক্ষীয় প্রতিনিধিত্ব কাঠামো চিত্রিত করা হয়েছে। তৈরি পোশাক খাতে ব্যাপকভিত্তিক কার্যকর ত্রিপক্ষীয় কাঠামোর নানা ধরন চিহ্নিত করা হয়েছে। এসব বিষয় সামনে নিয়ে আসতে এই গবেষণার মাধ্যমে নতুন কাঠামো দাঁড় করানো হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো, বাংলাদেশের পোশাক খাতের সুনাম সব সময়ের মতোই শক্তিশালী ও দৃঢ় রাখা।

এই গবেষণায় দেখানো হয়েছে যে, উচ্চ পর্যায়ে কার্যকর শ্রমিক প্রতিনিধিত্বের অভাব থাকায় শ্রমিকেরা তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য যথেষ্ট শক্তি অর্জন করতে পারে না। মালিকেরা শুধু স্থিতিশীলতা রক্ষা করতে চান। সে জন্য তারা শুধু শিল্প খাতে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও উৎপাদন চলমান রাখতেই হস্তক্ষেপ করেন। ফলে বিরোধ নিস্পত্তির জন্য যেসব পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, সেগুলো বাস্তবে শ্রমিকদের দাবি ও স্বার্থ দমনে চাপ প্রয়োগ ও প্ররোচনার হাতিয়ারেও পরিণত হয়, যা শুধু শ্রমিকদের প্রতি অন্যায় নয়, শিল্প কারখানায় শান্তি প্রতিষ্ঠারও অন্তরায়। ফলে এই সব দাবি দাওয়া ভিন্ন রূপে অন্য সময়ে হাজির হয়। এসব পদ্ধতিতে শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার অস্বীকার করা হয়, অথবা এমন এক জবরদস্তিমূলক মীমাংসা করা হয়, যা শ্রমিক বা মালিক কারও কাছেই গ্রহণযোগ্য হয় না।

এই গবেষণায় যে বিষয়টি বলার চেষ্টা করা হয়েছে, তা হলো কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা, মজুরি এবং পোশাক খাতে উপযুক্ত কাজ নিশ্চিতকরণে একটি নিয়মিত মতবিনিময় এবং দ্রুত ও দৃশ্যমান ত্রিপক্ষীয় পদ্ধতি প্রয়োজন। ত্রিপক্ষীয় ব্যবস্থার কারণে সরকার, শ্রমিক ও মালিকদের প্রতিনিধিদের মধ্যে সমান ও স্বাধীন সামাজিক অংশীদার হিসেবে সক্রিয় মিথস্ক্রিয়া নিশ্চিত হয়। মতবিনিময়ের লক্ষ্যে এই ত্রিপক্ষীয় পদ্ধতি নিয়মিত আহ্বান করতে হবে। শুধু মালিক, শ্রমিক ও সরকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে অন্যান্য অংশীজনকেও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

এই গবেষণা প্রতিবেদনটি 'বিল্‌স-এফইএস কর্মক্ষেত্র সহযোগিতা কর্মসূচি'-এর একটি ফসল। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. জাকির হোসেন ও বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স এর গবেষণা কর্মকর্তা ড. আফরোজা আক্তার এই প্রতিবেদনটি তৈরি করেছেন। গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনায় বিল্‌স ও এফইএসের কাছ থকে গবেষণা দল ব্যাপক সহযোগিতা পেয়েছে। বিল্‌স গবেষণা উপদেষ্টা কমিটির সদস্যদের কাছে আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। গবেষণায় উপদেষ্টা সহায়তা দেওয়ায় বিল্‌স-এর চেয়ারম্যান মোঃ হাবিবুর রহমান সিরাজ, বিল্‌স উপদেষ্টা পরিষদ ও নির্বাহী পরিষদ সদস্যদের কাছে আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। সরকারি কর্মকর্তা, বিজিএমইএ, সকল মালিক ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ, মূল তথ্যদাতা ও পরামর্শ বৈঠকে অংশগ্রহণকারীরা চিন্তাভাবনা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করায় আমরা তাঁদের অবদান আনন্দের সঙ্গে স্বীকার করছি।

এই গবেষণায় বুদ্ধিবৃত্তিক সহায়তার জন্য ফ্রেডরিখ-ইবার্ট-স্টিফটাং (এফইএস)-এর সাবেক আবাসিক

প্রতিনিধি হেনরিক ম্যায়হেককে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। সেই সঙ্গে বিল্‌স-এর কর্মী এস.এম. কামরুজ্জামান ও সজীবকে তাদের গবেষণা সহায়তার জন্য এবং এফইএস-এর কর্মসূচি সমন্বয়ক অরুণদ্যুতি রাণীকে গবেষণা সংগঠিত করায় কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আমরা আশা করি, বাংলাদেশের পোশাক খাত এবং এর আকৃতি, আওতা, বৈধতা ও প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতির মধ্যে ত্রিপক্ষীয় ফোরামের প্রস্তাবিত স্থায়ী কাঠামো এই খাতে সমন্বয়পূর্ণ শিল্প ও শ্রম সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা পালন করবে। যদি ত্রিপক্ষীয় ও অন্যান্য অংশীজনদের আলোচনায় এই গবেষণা প্রতিবেদনটি আনা হয়, তাহলে আমরা আশা করব বিল্‌স ও এফইএস-এর যৌথ কর্মসূচি বাংলাদেশের পোশাক খাতে সমন্বয়পূর্ণ শিল্প ও শ্রম সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখবে। পোশাক খাতে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ পেশ করতে হয়। সে জন্য একটি স্থায়ী ত্রিপক্ষীয় ফোরাম গঠন প্রয়োজন হলেও দীর্ঘদিন ধরে তা হচ্ছে না।

সরকারের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা, মালিক সংঘ ও সমিতির নেতৃবৃন্দ, জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংঘের নেতৃবৃন্দ, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, শিক্ষায়তনের সভ্য ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের কিছু সুপারিশ আমরা দ্বিতীয় সংস্করণে সংযুক্ত করেছি। আশা করি, এগুলো এই ধারণার উৎকর্ষ সাধনে অধিকতর সাহায্য করবে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মিকাইল শিপার, যুগ্ম সচিব জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম, যুগ্ম সচিব জনাব খন্দকার মোস্তান হোসেন, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) এ দেশীয় পরিচালক জনাব শ্রীনিবাস বি রেড্ডি, বিজিএমইএ-এর জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি জনাব ফারুক হাসান, বিকেএমইএ-এর সাবেক সহসভাপতি জনাব মোহাম্মদ হাতেম, জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংঘের নেতৃবৃন্দ ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের জন্য আমরা তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

নজরুল ইসলাম খান
মহাসচিব, বিল্‌স

ফ্রানজিস্কা কর্ন
আবাসিক প্রতিনিধি, এফইএস

আদ্যাক্ষরসমষ্টি

বিবিএস	বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটেসটিকস
বিইএফ	বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন
বিল্‌স	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ
ডিআইএফই	ডিপার্টমেন্ট অব ইন্সপেকশন ফর ফ্যাক্টরিজ অ্যান্ড এস্টাব্লিশমেন্ট
ডিওএল	ডিপার্টমেন্ট অব লেবার
এফজিডি	ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন
এফইএস	ফ্রেডরিখ-ইবার্ট-স্টিফটুং
জিডিপি	গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট
জিওবি	গভর্নমেন্ট অব বাংলাদেশ
আইএলও	ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন
কেআইআই	কি ইনফরম্যান্ট ইন্টারভিউস
এলএফএস	লেবার ফোর্স সার্ভে
এমওএলই	মিনিস্ট্রি অব লেবার অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট
এমওসি	মিনিস্ট্রি অব কমার্স
এমওএইচপিডব্লিউ	মিনিস্ট্রি অব হাউজিং অ্যান্ড পাবলিক ওয়ার্কস
স্কপ	শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ
টিইউ	ট্রেড ইউনিয়ন
বিজেএসজে	বাংলাদেশ জাতীয় শ্রমিক জোট
বিএমএসএফ	বাংলাদেশ মুক্ত শ্রমিক ফেডারেশন
জেএসএফ	জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশন
টিসিসি	ট্রাইপারটাইট কনসালটেটিভ কাউন্সিল
এসসিএফ	সোশ্যাল কমপ্লায়েন্স ফোরাম ফর আরএমজি
সিএমসি	ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিটি
এনটিসি	ন্যাশনাল ট্রাইপারটাইট কমিটি
এনটিপিএ	ন্যাশনাল ট্রাইপারটাইট প্ল্যান অব অ্যাকশন
বিজিএমইএ	বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন
বিকেএমইএ	বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন
আরএমজি	রেডিমেড গার্মেন্টস
ইপিজেড	এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোনস
বিইপিজেডএ	বাংলাদেশ এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোনস অথোরিটি
বিএলএ	বাংলাদেশ লেবার অ্যাক্ট
ইডব্লিউডব্লিউএআইআরএ	ইপিজেড ওয়ার্কার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন অ্যাক্ট
ডিআইআর	ডিপার্টমেন্ট অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন
আরপিসিসি	রানা প্লাজা কোর্ডিনেটিং সেল
সিবিএ	কালেকটিভ বার্গেনিং এজেন্ট
টিসিসি	ট্রাইপারটাইট কনসালটেটিভ কমিটি
ইপিবি	এক্সপোর্ট প্রসেসিং ব্যুরো
ওএসএইচ	অকুপেশনাল সেফটি অ্যান্ড হেলথ
বিটিএমএ	বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিল অ্যাসোসিয়েশন
বিসিসিএমইএ	বাংলাদেশ করোগেটেড কার্টন অ্যান্ড এক্সেরিজ ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন
বিটিটিএলএমইএ	বাংলাদেশ টেরি টাওয়েল অ্যান্ড লিনেন ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন

সূচিপত্র

১. ভূমিকা ০৭

২. শিল্প বিরোধ এবং বিরোধ নিস্পত্তি ০৯

- শিল্প বিরোধের কারণ ও প্রবণতা ০৯
- শিল্প বিরোধ নিস্পত্তির উপায় ১১
- শ্রম প্রশাসন ১২
- ধর্মঘটের অধিকার ও কারখানায় তালা দেওয়া ১২
- শ্রম বিচার বিভাগ ১৪
- স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিত্ব ১৫
- শ্রম ত্রিপক্ষীয়তার প্রয়োজনীয়তা ০০

ভিতরের পাতায় এই হেডিংটা পাওয়া যায়নি

৩. শ্রম খাতে ত্রিপক্ষীয় ব্যবস্থার বর্তমান অবস্থা ১৬

- বাংলাদেশের বর্তমান ত্রিপক্ষীয় ফোরামের কাঠামো ১৬
- কাজের সময় ১৬
- ফোরামের সদস্য ১৮
- কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব ১৮
- ফোরামের বর্তমান অবস্থা ১৮
- ত্রিপক্ষীয় ফোরামের কাজ ১৮
- বিভিন্ন ফোরামের সমন্বয় পদ্ধতি এবং সহযোগিতামূলক ব্যবস্থা ১৯
- অর্জন ও প্রতিবন্ধকতাসমূহ ২০
- একটি সমন্বয়পূর্ণ শিল্প-সম্পর্কের জন্য যেসব কাঠামোগত পরিবর্তন প্রয়োজন ২০

৪. ত্রিপক্ষীয় একটি ফোরামের স্থায়ী কাঠামো গঠনের পথে ২১

- প্রস্তাবিত ত্রিপক্ষীয় কাঠামো: ফোরাম, আওতা এবং বৈধতা ২১
- প্রতিনিধি বাছাই প্রক্রিয়া ২১
- প্রাতিষ্ঠানিক কার্যপদ্ধতি ২২
- বিভিন্ন বাধা ও ভবিষ্যতের পথ ২২

তথ্যপঞ্জি ২৩

সংযুক্তি ২৩

সংযুক্তি-১: তৈরি পোশাক খাতের পরিচিতি: শিল্প, শ্রম ও ব্যবসা ২৩

সংযুক্তি-২: গুরুত্বপূর্ণ তথ্যদাতাদের তালিকা ২৫

সংযুক্তি-৩: কেআইআই নির্দেশনা ২৭

সংযুক্তি-৪: তৈরি পোশাক খাতে ত্রিপক্ষীয় পরামর্শমূলক কমিটি গঠন: সুযোগ ও চ্যালেঞ্জ ২৯

অংশীদারদের ভূমিকা শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক ৩২

(ভিতরের পাতায় এবং সুচিতে অমিল রয়েছে)

১. ভূমিকা

বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য তৈরি পোশাক খাত অসীম গুরুত্ব বহন করে। উৎপাদন রপ্তানির ৮০ শতাংশ এবং ৩০ লাখ কর্মসংস্থান এই খাতেরই অবদান। দেশের প্রথাগত রপ্তানি পণ্য ছাপিয়ে মাত্রা ও মূল্যের দিক থেকে পোশাক পণ্যের পরিমাণগত উন্নয়ন ঘটেছে। নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের পোশাক শ্রমিকেরা এই খাতের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং জাতীয় অর্থনীতিকে সহায়তা করার ক্ষেত্রে সম্পদ হিসেবে কাজ করে (বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতের সংক্ষিপ্ত ধারনার জন্য সংযুক্তি-১ দেখুন)।

কাজ ও কর্মক্ষেত্রের সুশাসনের মান নির্ধারিত হয় অনেকটা নীতি নির্ধারণ, প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে প্রবর্তিত শ্রম প্রশাসন ব্যবস্থার দক্ষতা দ্বারা। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের শ্রম নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের কেন্দ্রে অবস্থিত। এই মন্ত্রণালয়ের একটি সংস্থা হিসেবে শ্রম অধিদপ্তর নীতি ও কর্মসূচির সামগ্রিক প্রশাসনিক কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন করে থাকে। হরতাল ও কাজ বন্ধ করে দেওয়াসহ শ্রম ও শিল্প বিরোধের মীমাংসাকারী হিসেবেও শ্রম অধিদপ্তর কাজ করে। কারখানা পরিদর্শন ও শ্রম আইন ভঙ্গের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের ও পরিচালনার একান্ত দায়িত্ব কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের (ডিআইএফই) ওপর ন্যস্ত। রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (ইপিজেড) ছাড়া বাকি সব পোশাক কারখানা ডিআইএফই-এর পর্যবেক্ষণের আওতাভুক্ত। আর ইপিজেড-এর ক্ষেত্রে এই দায়িত্ব পালনে শিল্প সম্পর্ক অধিদপ্তর (ডিআইআর) বিকল্প হিসেবে কাজ করে।

প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা থাকার পরও এই খাতের শ্রমিকেরা বাজে কর্মপরিবেশ, শ্রম আইনের ধারাবাহিক লঙ্ঘন ও বাস্তবায়ন পদ্ধতির অভাবে ভোগান্তির শিকার হয়। রানা প্লাজা ধস ও তাজরীন গার্মেন্টসে অগ্নিকাণ্ডসহ নানা দুর্ঘটনার ফলে এ খাতের পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। সব মিলিয়ে মালিক ও শ্রমিকদের নানা স্বার্থের দ্বারা পোশাক খাত যেন পরিবেষ্টিত হয়ে আছে। যেহেতু কারখানা পর্যায়ে শ্রমিকদের অভিযোগ মেটানোর ব্যবস্থা নেই, তাই শেষ পর্যন্ত শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের ভাষা হয় প্রতিবাদ।

বিরোধ মীমাংসার এই নৈরাশ্যজনক অবস্থার মূল কারণ হলো কারখানা ও খাত পর্যায়ে সামাজিক সংলাপের অভাব বা নিম্ন কার্যক্ষমতা। দ্বিপক্ষীয় ও ত্রিপক্ষীয় উভয় প্রকার প্রতিষ্ঠানই আছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে অসংখ্য কমিটি রয়েছে। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাদের কর্তৃত্ব সুস্পষ্ট নয়। সে জন্য, প্রায়ই বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ভূতাপেক্ষ ভিত্তিতে বিবাদের মীমাংসা করে। এ ছাড়া, কোনো বিশেষ ত্রিপক্ষীয় ফোরামের যথেষ্ট কর্তৃত্ব না থাকার মানে হলো, শ্রমিকদের স্বার্থও কদাচিৎ নিশ্চিত হওয়া। পোশাক খাতের অভিজ্ঞতা থেকে স্পষ্ট দেখা যায়, যখনই অস্থিরতা তৈরি হয়, সরকার কিছু ত্রিপক্ষীয় বৈঠক ডাকে, কিন্তু সেগুলো স্থায়ী কমিটির দ্বারা মীমাংসিত হয় না। যারা এসব বৈঠক ডাকে তাদের ভূমিকা দেশের বর্তমান নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

শ্রমিকদের প্রতিবাদে মালিক ও সরকারের হস্তক্ষেপের ধরন দেখে বোঝা যায়, সংকট সমাধানের ভূতাপেক্ষ নীতি ও কৌশল শুধু নাগরিক অবাধ্যতা ও বিশৃঙ্খলা থামিয়ে এই খাতে স্থিতি আনয়নে জোর দেয়। কিন্তু শ্রমিকদের পথে নেমে বিক্ষোভ ও অবরোধের মূল কারণের গভীরে যায় না। এর ফলে বিরোধ মীমাংসার পরিবর্তে এই ব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে আরও তীব্র আকারে দ্বন্দ্বের অবস্থা সৃষ্টি করে।

বস্তুত, এটা একটা দুষ্টচক্র। উচ্চ পর্যায়ে প্রতিনিধিত্ব না থাকায় শ্রমিকেরা তাদের স্বার্থ রক্ষায় দুর্বল হয়ে পড়ে। মালিকেরা শুধু স্থিতিশীলতা রক্ষা করতে চায়। ফলে শিল্প স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা ও উৎপাদন চালিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যেই তারা হস্তক্ষেপ করে। ফলশ্রুতিতে, বিবাদ মীমাংসার জন্য যেসব পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় সেগুলো হলো শ্রমিকদের দাবি ও স্বার্থ দমনে চাপ প্রয়োগ ও প্ররোচনা। যার ফলে ভিন্নরূপে সেসব দাবিদাওয়া অন্য কোনো সময়ে আবারও হাজির হয়। স্পষ্টতই, এই চক্রটি শ্রমিকদের দুর্দশা ও স্বার্থের মূল কারণের ধারে কাছেও পৌঁছায় না। ফলে এমন সব পরিণতি ও ফলাফল তৈরি হয় যা শুধু শ্রমিকদের প্রতিই অন্যায় নয়, শিল্প কারখানায় শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রতিও অবিচার। এই রকম দুষ্টচক্রের ফলে, হয় শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার অস্বীকার করা হয়, অথবা এমন এক জবরদস্তিমূলক মীমাংসা হয় যা শ্রমিক বা মালিক কারও কাছেই গ্রহণযোগ্য হয় না।

কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে, মজুরি নিষ্পত্তি ও পোশাক খাতে উপযুক্ত কাজ নিশ্চিতকরণে একটি নিয়মিত মতবিনিময় এবং দ্রুত ও দৃশ্যমান ত্রিপক্ষীয় পদ্ধতি প্রয়োজন। এর ফলে সরকার, শ্রমিক ও মালিকদের প্রতিনিধিদের মধ্যে সমান ও স্বাধীন সামাজিক অংশীদার হিসেবে সক্রিয় মিথস্ক্রিয়া নিশ্চিত হয়। মতবিনিময়ের লক্ষ্যে এই ত্রিপক্ষীয় পদ্ধতি নিয়মিত আহ্বান করতে হবে। এটা শুধু মালিক, শ্রমিক ও সরকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে অন্যান্য অংশীদারদেরও অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে যেমন ব্র্যান্ড, ক্রেতা, শ্রমিক অধিকার রক্ষা এনজিও ও সুশীল সমাজের অন্যান্য সদস্যদেরকে। পোশাক খাতে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ প্রদান করতে হয়। সে জন্য একটি স্থায়ী ত্রিপক্ষীয় ফোরাম গঠন প্রয়োজন হলেও দীর্ঘদিন ধরে তা অনিষ্পন্ন রয়ে গেছে।

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হলো বিদ্যমান ত্রিপক্ষীয় প্রতিনিধিত্ব কাঠামোর ছক আঁকা এবং তৈরি পোশাক খাতে একটি ব্যাপকভিত্তিক কার্যকর ত্রিপক্ষীয় কাঠামো প্রতিষ্ঠার প্রকরণগুলো চিহ্নিত করা। এ লক্ষ্যে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো হলো: (ক) শিল্প বিবাদগুলোর প্রবণতা ও কারণগুলো বিশ্লেষণ করা এবং এসব সমাধানকল্পে সুযোগ ও প্রতিবন্ধকতাগুলো চিহ্নিত করা; (খ) এই খাতের বিদ্যমান ত্রিপক্ষীয় কাঠামোগুলোর ছক আঁকা এবং সংকট নিরসনে এসবের ভূমিকা, কার্যক্রম ও প্রতিবন্ধকতাগুলো পর্যালোচনা করা; এবং (গ) একটি স্থায়ী ত্রিপক্ষীয় কাঠামোর জন্য পরামর্শ বা অ্যাডভোকেসির প্রকরণগুলো প্রতিষ্ঠায় একটি স্পষ্ট নির্দেশনা চিহ্নিত করা ও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা, এবং নিয়মিত সামাজিক সংলাপের জন্য কিছু নির্দিষ্ট সুপারিশমালা তৈরি করা।

তৈরি পোশাক খাতে একটি স্থায়ী/বৈধ ত্রিপক্ষীয় কাঠামো প্রতিষ্ঠার প্রকরণগুলো তৈরি করার লক্ষ্যে প্রাথমিক ও আনুষঙ্গিক উভয় প্রকার উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। আনুষঙ্গিক উৎসের মধ্যে রয়েছে এ খাতের বিদ্যমান দ্বিপক্ষীয় ও ত্রিপক্ষীয় কাঠামো, এর ভূমিকা, কার্যক্রম ও প্রতিবন্ধকতা বিষয়ক বিদ্যালোচনা ও বিশ্লেষণ (লিটারেচার রিভিউ)। মূল তথ্যদাতার সাক্ষাৎকারের (কেআইআই) ভিত্তিতে প্রাথমিক তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে। এসব সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণকারীদের নামের তালিকা এবং আলোচনার জন্য একটি চেকলিস্ট যথাক্রমে সংযুক্তি-২ ও সংযুক্তি-৩-এ পাওয়া যাবে। খসড়া প্রতিবেদনটি জাতীয় ও খাত পর্যায়ের (আরএমজি) ট্রেড ইউনিয়নগুলোর পাশাপাশি আলোচনায় অংশ নেওয়া বহু পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারদের দেওয়া হয়েছে।

চারটি মূল ভাগে গবেষণাটি উপস্থাপন করা হয়েছে। ভূমিকার পরের ভাগে শিল্প বিবাদের প্রবণতা ও কারণ এবং বিবাদ মীমাংসার প্রক্রিয়া দৃষ্টিগোচর করা হয়েছে। এই ভাগে দ্বান্দ্বিক শিল্প ও শ্রম বিবাদের কারণগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে এবং তৈরি পোশাক খাতে ত্রিপক্ষীয় কাঠামোর গুরুত্বের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। তৃতীয় ভাগে দ্বিপক্ষীয় ও ত্রিপক্ষীয় বর্তমান কাঠামো, তাদের কার্যক্রম, সমন্বয় পদ্ধতি, সহযোগিতামূলক ব্যবস্থা, এবং অর্জন ও যেসব প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সমন্বয়পূর্ণ শিল্প ও শ্রম সম্পর্কের লক্ষ্যে ত্রিপক্ষীয় কাঠামোর মধ্যে আকাঙ্খিত কাঠামোগত পরিবর্তনগুলো সম্পর্কেও এই অংশে আলোচনা করা হয়েছে। আরএমজি খাতের জন্য একটি ব্যাপকভিত্তিক বৈধ ত্রিপক্ষীয় ফোরাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে টিইউ-এর নিয়মিত সামাজিক সংলাপের জন্য অধিপরামর্শ বা অ্যাডভোকেসি দিকনির্দেশনার রূপরেখা দেওয়া হয়েছে শেষ ভাগে।

২. শিল্প বিরোধ এবং বিরোধ নিস্পত্তি

স্বার্থের ভিন্নতা থাকার কারণে শিল্প সম্পর্কে দ্বন্দ্ব ও বিরোধ থাকা স্বাভাবিক। মূলত নিয়োগের শর্ত নিয়ে কর্মীর সঙ্গে নিয়োগকর্তার মতদ্বৈততার কারণে এটি ঘটে থাকে। একই সঙ্গে, কর্মীর সঙ্গে কর্মী বা নিয়োগকর্তার সঙ্গে শ্রমিক প্রতিনিধির মতানৈক্যের কারণে এটি ঘটে থাকে। বাংলাদেশের শ্রম আইন ২০০৬ এর ২(৬২) ধারা অনুসারে 'শিল্প বিরোধ' হলো, নিয়োগকর্তার সঙ্গে নিয়োগকর্তার, নিয়োগকর্তার সঙ্গে কর্মীর, কর্মীর সঙ্গে কর্মীর, নিয়োগ বা অন্য কোনো ব্যাপার বা শ্রমের শর্ত ও পরিবেশ নিয়ে বিতর্ক ও ভিন্নতা'। শিল্প বিরোধ যেমন ব্যক্তি পর্যায়ে ঘটতে পারে, তেমনি সামষ্টিক পর্যায়েও হতে পারে। ব্যক্তি পর্যায়ের বিরোধে শ্রমিক জড়িত থাকে, যেখানে সামষ্টিক বিরোধে শ্রমিকদের কোনো একটি গোষ্ঠী জড়িত থাকে, যার প্রতিনিধিত্ব করে ট্রেড ইউনিয়ন। শিল্প বিরোধ সৃষ্টি হলে ব্যবস্থাপনা ও শ্রমিকেরা পরস্পরের ওপর জোর খাটানোর চেষ্টা করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ লক-আউট করতে পারে, যেখানে শ্রমিকেরা ধর্মঘট, পিকেটিং ঘেরাওয়ের মতো কর্মসূচি দিতে পারে।

এই অংশে শিল্প বিরোধের কারণ এবং তা সমাধানের প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করা হয়েছে। একই সঙ্গে, এখানে বাংলাদেশের শ্রম সম্পর্কে দ্বন্দ্বের কারণ চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পে ত্রিপক্ষীয় ব্যবস্থার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শিল্প বিরোধের কারণ ও প্রবণতা

বাংলাদেশের ইতিহাসে শিল্প ও শ্রম সম্পর্ক কদাচিৎ বৈরিতামুক্ত ছিল। বাংলাদেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে ফি বছর নানা শিল্প বিরোধ সৃষ্টি হয়, যদিও তৈরি পোশাক শিল্পেই তা সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া কঠিন হলেও সংবাদপত্রের প্রতিবেদন থেকে দেখা যায়, ২০০৮ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর বিভিন্ন খাতে গড়ে ২৫৯টি শিল্প বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। এর মধ্যে শ্রম অধিকার ও মান লঙ্ঘনের কারণে ১৭৫ টি সামষ্টিক বিরোধ ঘটেছে। তবে এটা পরিষ্কার, ২০০৮, ২০০৯ ও ২০১৩ সালে তৈরি পোশাক শিল্পে যথাক্রমে ২০৯, ১৭৯ ও ১৯৯ টি বিরোধ ঘটেছে, যেটা গড় সংখ্যার চেয়ে বেশি। আর সবচেয়ে কম ১৩৮ টি বিরোধ

সারণী ২.১: সর্বমোট সংখ্যার বিপরিতে পোশাকখাতে সংঘটিত শ্রম অসন্তোষের চিত্র

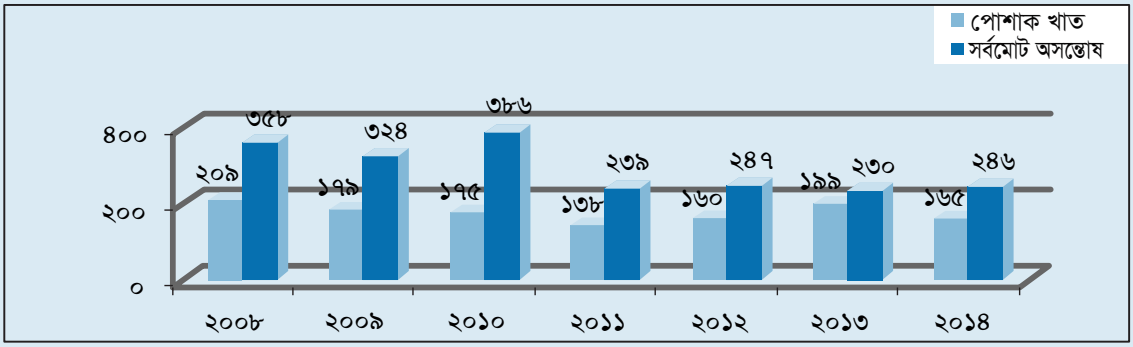

সূত্র: বিল্‌স ডাটাবেস ও শ্রম বিষয়ক মিডিয়া রিপোর্ট

সৃষ্টি হয়েছে ২০১১ সালে শিল্প বিরোধের সাধারণ বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে ধর্মঘট, সড়ক অবরোধ, মিছিল-সমাবেশ, অবস্থান ধর্মঘট, প্রতিবাদ মিছিল, কর্তৃপক্ষকে ঘেরাও আর মানববন্ধন। ২০০৬ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত শিল্প বিরোধের সবচেয়ে সাধারণ রূপ ছিল অবস্থান ধর্মঘট ও প্রতিবাদ মিছিল(৯৬ শতাংশ), এরপর ছিল ধর্মঘট ও কর্মবিরতি(৮৯ শতাংশ)। এ শিল্প বিরোধের অন্যান্য রূপও দেখা যায়: অবরোধ(৭৮ শতাংশ), আবেদন-নিবেদন(৩২ শতাংশ), কারখানা ও অন্যান্য সম্পদের ক্ষতিসাধন(৩১ শতাংশ)।

শ্রম বিরোধের কারণ নানবিধ, কিন্তু এটাকে সাধারণভাবে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়, অর্থনৈতিক ও অর্থনৈতিক নয়। অর্থনৈতিক কারণের মধ্যে আছে মজুরি, বোনাস, ভাতা, কর্মপরিবেশ, কর্মঘণ্টা, ছুটি, বিনা বেতনে ছুটি, অনৈতিক ছাঁটাই ও ব্যয়সংকোচ। অর্থনৈতিক নয় এমন কারণের মধ্যে আছে শ্রমিকদের সঙ্গে অন্যায্য ব্যবহার, শ্রমিকদের প্রতি নিয়োগকর্তার বৈরী আচরণ, ধর্মঘট, রাজনৈতিক কারণ ও কর্মক্ষেত্রে অনিয়ম ও গুজব। অর্থনৈতিক কারণটা অধিকতর পরিষ্কার, কারণ এর ফলে শ্রম ও পুঁজি বিপরীতমুখে ধাবিত হয়।

সাধারণভাবে বলা হয়, পোশাক শ্রমিক ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের মধ্যে সব সময় বিরোধ লেগেই থাকে, কারণ

শ্রমিকেরা মজুরি বাড়াতে চায়, যেখানে নিয়োগকর্তারা চায় খরচ কমাতে। তবে এটা স্পষ্ট, তৈরি পোশাক কারখানায় শ্রমিকদের সুনির্দিষ্টভাবে শোষণ করা হয়। তাদের দীর্ঘ সময় ধরে ক্লান্তিকর কাজ করতে হয়। কিন্তু কারখানায় আনুষ্ঠানিক শ্রম সম্পর্ক নেই, একই সঙ্গে তাদের অধিকার ও সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হয়।

এসব বিরোধের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, ২০০৬ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত যত বিরোধিতা হয়েছে তার ৫৯

সারণী ২.২: পোশাকখাতের শ্রমিকদের অসন্তোষের পেছনে দাবীসমুহ

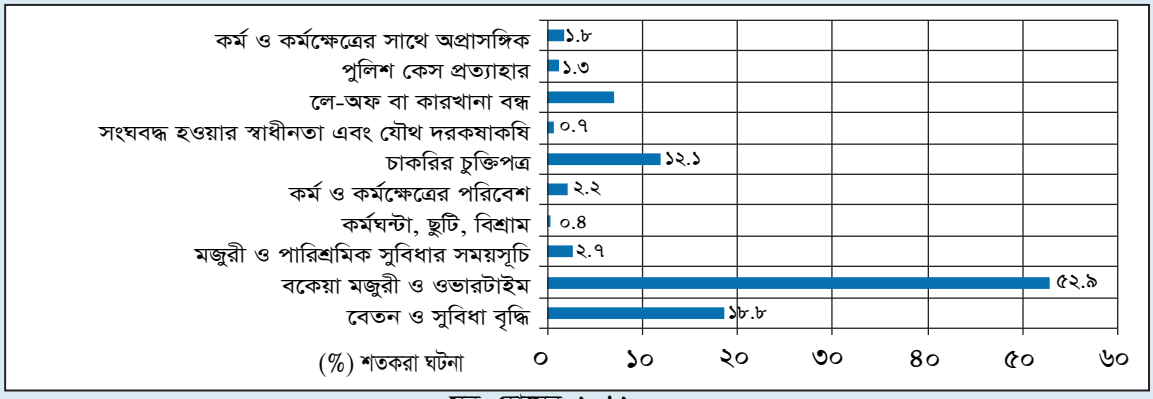

সূত্র: হোসেন, ২০১২

শতাংশই (৫৩ শতাংশ বিলম্বে বেতনের দাবিতে এবং বাকি তিন শতাংশ বকেয়া বেতনের দাবিতে) আর্থিক দেনা কেন্দ্র করে। আর মাত্র ১৯ শতাংশ হয়েছে বেতন ও অন্যান্য সুবিধাদি বৃদ্ধির দাবিতে।

মূলত সুনির্দিষ্ট অধিকার লঙ্ঘনের প্রতিবাদে শ্রমিকেরা প্রতিবাদ করেছে, যার মধ্যে আছে মজুরি ও ওভারটাইম না দেওয়া বা বিলম্বে দেওয়া। একই সঙ্গে তারা শ্রম সময়, ছুটি ও বিশ্রামের দাবিতেও আন্দোলন করেছে (প্রায় ১ শতাংশ ক্ষেত্রে)। ৭ শতাংশ ক্ষেত্রে শ্রমিকেরা কারখানা বন্ধের প্রতিবাদে বিক্ষোভ করেছে। এ ছাড়া ১২ শতাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, চুক্তি লঙ্ঘন ও মালিকের খারাপ ব্যবহার এবং অবৈধ ও স্বেচ্ছাচারীভাবে শ্রমিককে বরখাস্ত করার কারণে শ্রমিকেরা পথে নামে (হোসেন, ২০১২)।

শ্রমিকদের দাবি সাধারণভাবে কর্ম ও কর্মস্থলের সঙ্গে সম্পর্কিত। বিশেষ করে শ্রমিকদের প্রণালিবদ্ধভাবে শোষণের সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে, যার অনেকটাই যথোচিত মজুরির ঊর্ধ্বে, যাদের মজুরি এখন দারিদ্র্যসীমার নিচে। সামগ্রিকভাবে তাদের স্বার্থেও প্রকৃতি সাধারণ, এর কোনো বিশেষ রূপ নেই। শ্রমিক বিক্ষোভের আরও দুটি কারণের মধ্য দিয়ে তাদের সাধারণ স্বার্থের ব্যাপারটা বোঝা যায়। একটি সমীক্ষার (হোসেন ২০১২) ফলাফল থেকে বোঝা যায়, শ্রমিক উত্তেজনা ও বিক্ষোভের মূল কারণটা অভ্যন্তরীণ(৫৯ শতাংশ), কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটি কারখানার ভেতরে শুরু হয়ে বাইরে ছড়িয়ে পড়ে। তবে মূলত নির্দিষ্ট একটি কারখানাতেই বিক্ষোভ শুরু হয়। ২০০৬ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত প্রায় ৮১ ভাগ বিক্ষোভ সুনির্দিষ্ট একটি কারখানাতে সৃষ্টি হয়, আর ১৯ শতাংশ ক্ষেত্রে বিপুলসংখ্যক শ্রমিক বিক্ষোভে অংশ নেয়।

সারণী ২.৩: শ্রম অসন্তোষের স্থান ও বিস্তৃতি

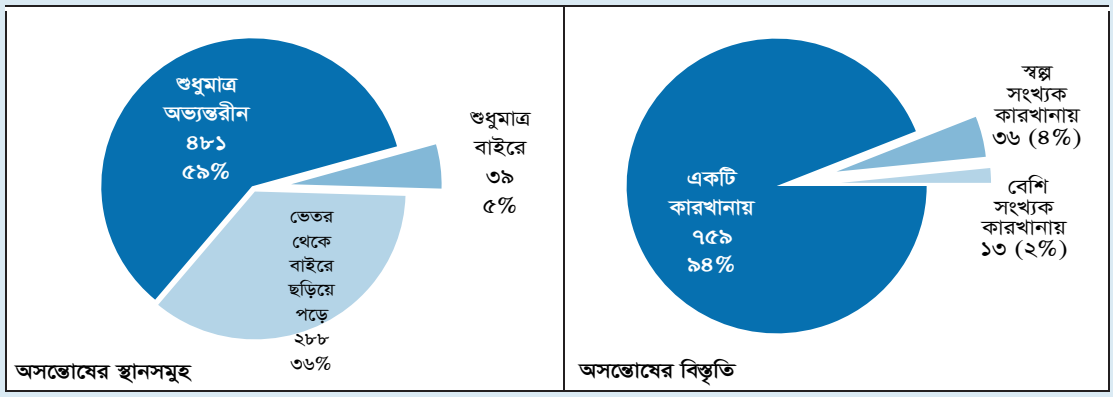

সূত্র: হোসেন, ২০১২

তবে প্রতিনিধিরা শ্রমিকদের যে স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করেন, তা দারিদ্র্যসীমার পর্যায়ের মজুরির চেয়ে অনেক গভীর। নিম্ন মজুরির পাশাপাশি শ্রমিক প্রতিনিধিরা প্রায়শই সাময়িক চুক্তিপত্র, সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধাদি, ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের ওপর নিপীড়ন, রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির সমস্যা এসব নিয়েও আন্দোলন করেন। এ ছাড়া বিক্ষোভে শ্রমিকদের স্বাথের্র যে ব্যাপারটা প্রতিফলিত হয়, সেটি মূলত অপ্রকাশ্য থাকে। যখন শোষণ শ্রমিকদের কাছে অসহনীয় হয়ে ওঠে, তখন এই গুপ্ত ব্যাপারটা জনসমক্ষে চলে আসে।

শ্রমিকদের স্বার্থের ব্যাপারটা যে অপ্রকাশ্য থাকে, তার কারণ হলো, তাঁরা বোঝেন, এসব প্রকাশ হলে মধ্যম সারির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ তাঁদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতে পারে অথবা এমনকি তাদের চাকরিও চলে যেতে পারে। উল্লিখিত সমীক্ষায় (হোসেন, ২০১২) শ্রমিকেরা বলেছেন, চাকরি হারানোর ভয়েই তাঁরা সামষ্টিকভাবে মাঠে নামেন না। শ্রমিকেরা বলেছেন, প্রতিবাদ করা ও সংঘবদ্ধ হওয়ার চেয়ে অন্য কারখানায় চলে যাওয়া কম ঝামেলাপূর্ণ । এতে তাদের স্বার্থের ব্যাপারটা চলে আসে। আর কোনো বিশেষ ঘটনায় তাদের স্বার্থের ব্যাপারটা প্রজ্বালিত হয়ে যায়, অপমান, নিগ্রহ, চাকরি হারানো বা হঠাৎ করে কারখানা বন্ধের ঘোষণায় এমনটি হয়। পরিস্থিতি যখন আরও নিপীড়নমূলক হয়ে ওঠে বা যখন দর-কষাকষির সুযোগ থাকে না, তখন শ্রমিকেরা হয় নীরব প্রতিবাদ হিসেবে চাকরি ছেড়ে যান (চিরতরে বা অন্য কোথাও যোগ দিতে) অথবা আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক মাধ্যমে দাবি প্রকাশ করেন। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ যখন একতরফাভাবে শ্রমিকদের ছাঁটাই করে বা তাঁদের বেতন ও ওভারটাইম বকেয়া রাখেন, তখন শ্রমিকদের আর রাস্তায় নামার বিকল্প থাকে না। তাঁরা আশা করে, এর মাধ্যমে নিয়োগকর্তাকে চাপে ফেলা যাবে বা সরকার তাঁদের পক্ষ থেকে হস্তক্ষেপ করবে।

দীর্ঘদিন ধরে চরমভাবে বেতন ও ওভারটাইম দিতে বিলম্ব হওয়ার মতো অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটতে থাকলে শ্রমিকেরা রাস্তায় নেমে আসেন, যা অন্য কারখানাগুলোতেও ছড়িয়ে পড়ে।

আবার মজুরি ও সুবিধাদির দাবি ছাড়াও কখনো কখনো মালিক বা ব্যবস্থাপকদের কর্মকাণ্ডের কারণেও শ্রমিকেরা সংঘবদ্ধ হয়ে রাস্তায় নেমে আসে। এর মধ্যে আছে শ্রমিকদের হয়রানি ও নিগ্রহ করা (৫ শতাংশ), হঠাৎ কারখানা বন্ধ (৭ শতাংশ), শ্রমিকদের বিরুদ্ধে পুলিশি মামলা(২ শতাংশ) ইত্যাদি।

সারণী ২.৪: শ্রম অসন্তোষের উৎস

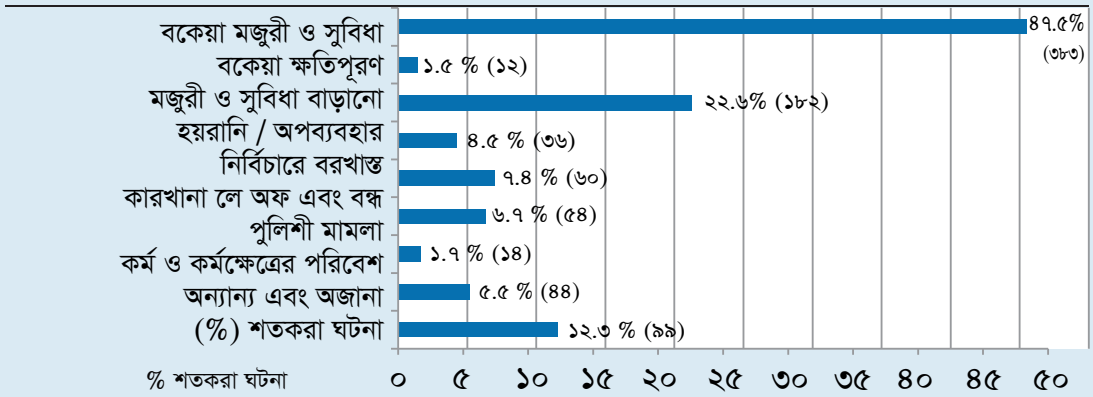

সূত্র: হোসেন, ২০১২

প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক-ব্যবস্থাপনা উত্তেজনা দূরীকরণের ব্যবস্থা না থাকায় কখনো কখনো এমন হয় যে শ্রমিকদের অসন্তোষ বহুদিন ধরে জমা হতে থাকে, আর তখন বিশেষ কোনো ঘটনায় প্রতিবাদ বিক্ষোভ শুরু হয়ে যায়। প্রতিবাদের মাধ্যমে শ্রমিকেরা নিয়োগকর্তা ও সরকারি কর্মকর্তাদের নিজস্ব দাবি দাওয়া আমলে নিতে বাধ্য করতে পারেন।

এই দাবি করা হচ্ছে না যে শ্রমিকেরা ব্যক্তিগতভাবে প্রতিবাদ করেন না। এমনকি নারী শ্রমিকেরাও অন্যায্য আচরণ ও উচ্চ মজুরির দাবিতে আন্দোলন করেন। বকেয়া বেতনের দাবিতেও তাঁরা প্রতিবাদ আন্দোলন করে থাকেন। এসব সত্ত্বেও অধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সাধারণত সামষ্টিক আন্দোলনই হয়ে থাকে।

শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তির উপায়

বিরোধ নিষ্পত্তি যে কোনো কার্যকর শ্রম বাজার ও শিল্প সম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। শ্রম সম্পর্কে অনিবার্যভাবে শ্রম বিরোধ দেখা যায়, আর একই সঙ্গে কার্যকরভাবে এবং দক্ষতা ও ন্যায্যতার সঙ্গে সকলের জন্য লাভজনক উপায়ে তা সমাধান করার প্রয়োজনীয়তাও শিল্প সম্পর্কে অনুভূত হয়। বৃহত্তর অর্থে অর্থনীতির জন্যও এটি জরুরি।

বিরোধ নিষ্পত্তির কার্যকর উপায় থাকলে তা নিয়োগকর্তাদের পক্ষে কর্মীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য সহায়ক হয়, কর্মস্থলের বিষয়াদি আমলে নেওয়ার মধ্য দিয়ে তা সম্ভব হয়।

এই অংশে বাংলাদেশে শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তির আইনি দিকগুলোতে আলো ফেলা হয়েছে। বিশ্লেষণ করা হয়েছে, এসব বিরোধ ঠিক কীভাবে নিষ্পত্তি করা হয়। এই ব্যাপারগুলো এখানে শ্রম প্রশাসন, শ্রম সংশ্লিষ্ট বিচার ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিত্বের আলোকে আলোচনা করা হয়েছে।

শ্রম প্রশাসন

প্রতিটি দেশের শ্রম প্রশাসন সাধারণত জাতীয় আইনে বিরোধ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত করে। বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ ও ইপিজেড ওয়ার্কার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন অ্যাক্ট ২০১০-এ শ্রম বিরোধ নিষ্পত্তির পন্থা পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এর ২১০ ধারায় ইপিজেড বহির্ভূত কারখানায় সিবিএর মাধ্যমে নিয়োগকর্তা ও শ্রমিকের মধ্যকার বিরোধ নিষ্পত্তির রূপরেখা আছে। আর ইপিজেডের কারখানার বিরোধ নিষ্পত্তির পন্থা ইপিজেড ওয়ার্কার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন অ্যাক্ট ২০১০-এ বর্ণিত আছে। এই আইনি প্রক্রিয়ায় তিনটি ধাপে শ্রম অধিকার ও বিরোধজনিত যে কোনো সমস্যার সমাধান করা যায়: আলোচনা, সমঝোতা ও সালিস।

আলোচনা

শ্রমিকদের সঙ্গে মালিকদের যখন বিরোধ সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়, তখন সিবিএর কাজ হচ্ছে, অন্য পক্ষের সঙ্গে লিখিত যোগাযোগ করা। চিঠি পাওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে ওই পক্ষ আলোচনার জন্য বৈঠক আয়োজন করবে। আর উভয় পক্ষ যদি ইতিবাচকভাবে সমস্যার সমাধান করে নেয়, তাহলে এই মীমাংসার রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে এবং তার একটি কপি সরকার ও আপসকারীর কাছে পাঠাতে হবে [ধারা ২১০(১,২,৩)]।

মীমাংসা

প্রথম বৈঠকের এক মাসের মধ্যে যদি আলোচনা ব্যর্থ হয়, তাহলে তা মীমাংসাকারীর কাছে পাঠাতে হবে। মীমাংসার মধ্য দিয়ে যদি বিরোধ নিষ্পত্তি হয়, তাহলে মীমাংসাকারী সরকারকে তা জানাবেন, সঙ্গে মীমাংসাপত্রও পাঠাবেন তিনি। কিন্তু মীমাংসা প্রক্রিয়া শুরুর ৩০ দিনের মধ্যে যদি তা সমাধান না হয়, তাহলে ধরে নেওয়া হবে যে এটা ব্যর্থ হয়েছে। এ ছাড়া উভয় পক্ষই যদি লিখিতভাবে রাজি হয়, তাহলে আলোচনা প্রক্রিয়ার মেয়াদ বাড়ানো যাবে [ধারা ২১০(৪-বি)]।

সালিস

মীমাংসা না হলে মীমাংসাকারী উভয় পক্ষকে এই মর্মে প্রভাবিত করার চেষ্টা করবেন, যাতে তারা বিষয়টি সালিস মধ্যস্থতাকারীর কাছে নিয়ে যান। উভয় পক্ষ রাজি হলে মীমাংসাকারী লিখিতভাবে বিষয়টি মধ্যস্থতাকারীকে জানাবেন, যাকে উভয় পক্ষেরই পছন্দ। মধ্যস্থতাকারী ৩০ দিন বা উভয় পক্ষের সম্মতির ভিত্তিতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাধান বের করবেন। এরপর তিনি উভয় পক্ষ ও সরকারের কাছে এর একটি কপি পৌঁছে দেবেন।

ধর্মঘটের অধিকার ও কারখানায় তালা দেওয়া

উভয় পক্ষ যদি (ইপিজেড বহির্ভূত শিল্প বিরোধ) বিরোধটি মধ্যস্থতাকারীর কাছে নিতে রাজি না হন, তাহলে সমঝোতা প্রক্রিয়া ব্যর্থ হওয়ার তিন দিনের মধ্যে সমঝোতাকারী তাদের একটি প্রত্যয়নপত্র দেবেন। এ ক্ষেত্রে যে পক্ষ বিরোধের প্রসঙ্গ তুলেছিল, তারা অপর পক্ষকে ধর্মঘট বা কারখানায় তালা দেওয়ার নোটিশ দিতে পারে। নোটিশ দেওয়ার সাত থেকে ১৪ দিনের মধ্যে তাদের এটা করতে হবে, তার আগে বা পরে নয়। কিন্তু নোটিশ দেওয়া ও ধর্মঘট করার জন্য দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতি লাগবে (বিএলএএ, ২০১৩)। ধর্মঘট ও লক আউট যদি ৩০ দিনের বেশি স্থায়ী হয়, তাহলে সমঝোতাকারী বিরোধটি শ্রম আদালতে পাঠাতে পারে, যারা এটিকে অবৈধ ঘোষণা করতে পারেন। অন্যদিকে ইপিজেডের ক্ষেত্রে সমঝোতা প্রক্রিয়া ব্যর্থ হলে কোনো পক্ষ ধর্মঘট বা লক-আউট করতে পারবে না। যদিও ইপিজেড আইন অনুসারে সংশ্লিষ্ট পক্ষ ইপিজেড ট্রাইব্যুনালে যেতে পারে, আজ পর্যন্ত ইপিজেড ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়নি। তা সত্ত্বেও বিষয়টি শ্রম আদালতে তোলা যাবে।

সম্প্রতি দেখা গেছে, ৯০ শতাংশের বেশি মামলা সমঝোতা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পুরোপুরি মিটিয়ে ফেলা গেছে। প্রথম দশকে এর পরিমাণ ছিল ৩৭ শতাংশ, পরবর্তী দশকে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৬৭ শতাংশে। সারণি ২.৫-এ ব্যর্থ ও ঝুলে থাকা মামলার তালিকা দেওয়া হয়েছে। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, সমঝোতা প্রক্রিয়া যখন বিরোধ নিষ্পত্তির পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তখন তা বিরোধ নিষ্পত্তিতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

---

১. সাধারণত ট্রেড ইউনিয়নকে যৌথ দরকষাকষির প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য করা হয়। একটি প্রতিষ্ঠানে যদি একটি নিবন্ধিত ট্রেড ইউনিয়ন থাকে তবে সেটিকে সিবিএ হিসেবে গণ করা হবে, তবে সেখানে যদি একাধিক ট্রেড ইউনিয়ন থাকে তাহলে নির্বাচনের মাধ্যমে সিবিএ গঠন করতে হবে (বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬, ধারা ২০২)। ইপিজেড এর ক্ষেত্রে শ্রমিক কল্যাণ সমিতির প্রতিনিধিরা সিবিএ হিসেবে কাজ করতে পারবেন [ইপিজেড ওয়ার্কার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন অ্যাক্ট-২০১০, ধারা ৩৭(১)]।

সারণী ২.৫: অসন্তোষ মীমাংসার উদ্যোগের চিত্র

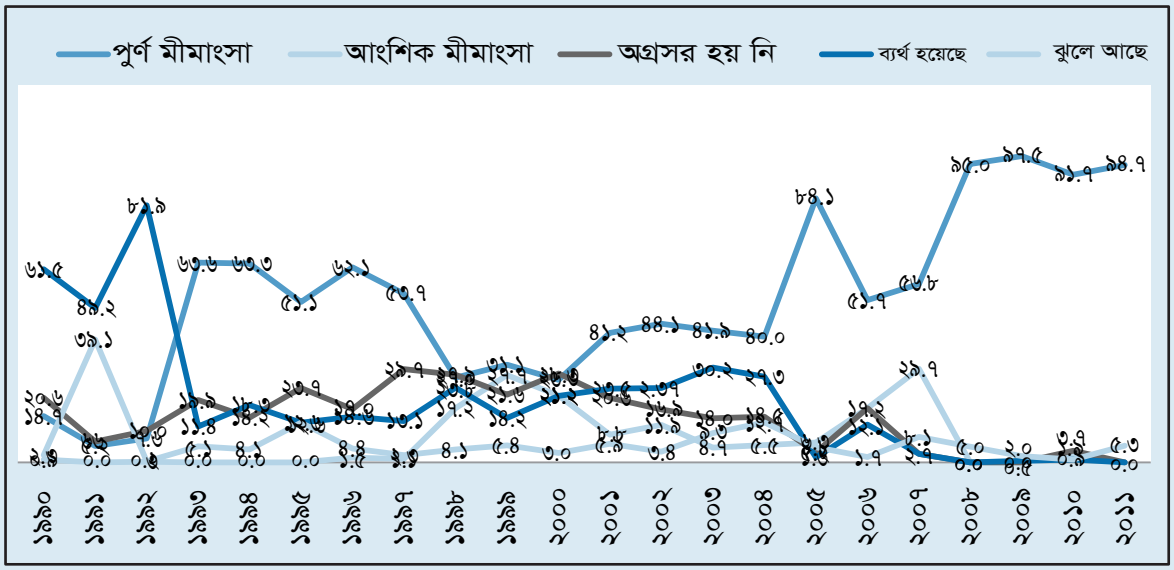

সূত্র: হোসেন, ২০১২

উল্লিখিত রেখাচিত্রে ভালোভাবে বোঝা যায়, খুব কমসংখ্যক মামলাই সমঝোতা প্রক্রিয়ায় আনা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৯০ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত গড়ে প্রতি বছর ৪০৩ টি বিরোধ আপস প্রক্রিয়ায় আনা হয়েছে, ২০০১ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত যার পরিমাণ দাঁড়ায় বছরে মাত্র ৭৪ টি। অর্থাৎ ১৯৯০ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত গড়ে প্রতি বছর ২৪৬টি মামলা এই প্রক্রিয়ায় আনা হয়েছে। এর বিপরীতে ১৯৯০ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত শ্রম আদালত ও শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনালে গড়ে ৪৯৯৫ ও ২৭৪ টি মামলা আনা হয়েছে।

ছক ২.১: অসন্তোষ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক কার্যকারিতা

বছর		সর্বমোট ঘটনা	নিষ্পত্তি	শ্রম আদালত ও আপীল ট্রাইবুনাল		
				শ্রম আদালত	আপীল ট্রাইবুনাল	সর্বমোট
গড়	১৯৯০-২০০	৬৫২২	৪০৩	৫৯৫৭	১৬১	৬১১৮
গড়	২০০১-২০১০	৪২৭২	৭৪	৩৯৩৬	৫২২	৪৪৫৮
গড়	১৯৯০-২০১০	৫৪৫০	২৪৬	৪৯৯৫	২৪৭	৫২৬৯
২০১১		৭৭১৯	১৪২	৭৫৭৭		৭৫৭৭
২০১২		৭৬৬৩	১৫৯	৭৫০৪		৭৫০৪
২০১৩				৭১৭৫	৫৩৪	৭৭১৩
২০১৪				৭৪১৪	৬৭২	৮০৮৬

তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ লেবার জার্নাল, বিভিন্ন ইস্যু, শ্রম অধিদপ্তর, বাংলাদেশ সরকার

এর মানে হলো, শ্রম আইন মান্য করার ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদান এবং শ্রম বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে শ্রম প্রশাসনের ভূমিকা দুর্বল। প্রশাসনিক প্রক্রিয়া প্রায়শই শ্রমিকদের দুঃখ-দুর্দশার শান্তিপূর্ণ সমাধান দিতে পারে না। এর মধ্য দিয়ে শ্রম আদালতের ওপর অযাচিত চাপ প্রয়োগ করা হয়, অর্থাৎ শ্রমিক ও নিয়োগকর্তাদের বিরোধ নিষ্পত্তি করতে হয় তাদের।

শ্রম বিচার বিভাগ

শ্রম আদালতে যেমন শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তি হয়, তেমনি ব্যক্তিগত দুঃখ-দুর্দশার ব্যাপারও আসে। মালিকেরা কখনো কখনো কোনো বিরোধ শ্রম আদালতে পাঠিয়ে দিতে পারেন, আবার সরকারও কখনো কখনো তা করে থাকে। দ্বিপক্ষীয় ও আলোচনা ও সমঝোতা প্রক্রিয়ার সুযোগ শেষ হয়ে গেলে বিবাদমান পক্ষ ধর্মঘট বা লক-আউট শুরুর আগে বা পরে শ্রম আদালতে বিষয়টি নিষ্পত্তির আবেদন করতে পারেন। মজুরি কর্তন করা হলে শ্রমিকেরা শ্রম আদালতে আবেদন করতে পারেন অথবা মজুরি এবং পারিতোষিক বা ভবিষ্য তহবিল প্রদানে বিলম্ব হলেও তারা আদালতে যেতে পারেন। কোনো শ্রমিককে বরখাস্ত করা বা অব্যাহতি দেওয়া হলে বা কারখানার ব্যয় সংকোচ করা হলে সেই শ্রমিক শ্রম আদালতে অভিযোগ করতে পারেন। শ্রমিক (মৃত হলে আইনি উত্তরাধিকারী) বা তাঁর কোনো আইনি প্রতিনিধি শ্রম আদালতে আবেদন করে প্রতিকার চাইতে পারেন।

শ্রমিকদের শ্রম আদালতে মামলা করার সময়ের সীমাবদ্ধতা থাকলেও আদালতে মামলা নিষ্পত্তি হতে অনেক সময় লেগে যায়। অধিকাংশ আদালতই নির্ধারিত ৬০ দিনে মামলা নিষ্পত্তি করতে পারে না। 'ছয় মাস থেকে এক বছর পর্যন্ত সময় লাগাটা ঠিক আছে, তবে প্রকৃতপক্ষে মামলা নিষ্পত্তি হতে এর চেয়ে বেশি সময় লাগে, বিশেষ করে যদি আবার আপিল করা হয়'(হোসেন, ২০১২)। এই সমীক্ষায় ফারুক (২০০৯) দেখিয়েছেন, চট্টগ্রাম শ্রম আদালতে ৫০ ভাগ মামলা নিষ্পত্তি হতে ১২ থেকে ৩৬ মাস সময় লেগেছে। ২৫ ভাগ মামলার ক্ষেত্রে সময় লেগেছে তিন থেকে পাঁচ বছর। ৮ ভাগ মামলার ক্ষেত্রে লেগেছে পাঁচ বছরের বেশি সময়। ঢাকার প্রথম ও দ্বিতীয় আদালতে এই সময় লেগেছে গড়ে সাড়ে ১৭ ও ৩১ মাস।

শ্রম আদালতে ১৯৯০ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত বছরে গড়ে ৪০৪৭ টি মামলা এসেছে। এর মধ্যে ২২৪৮ টি মামলার নিষ্পত্তি হয়, আর বাকিগুলো ঝুলে ছিল। দেখা গেল, নিষ্পত্তি হওয়া মামলার অনুপাতে ঝুলে থাকা মামলার সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে।

সারণী ২.৬: শিল্প অসন্তোষ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে শ্রম আদালতের ভূমিকা

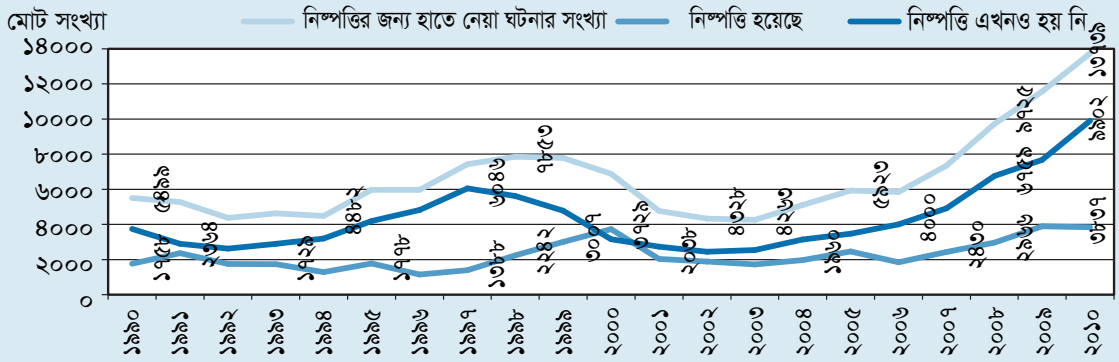

তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ লেবার জার্নাল, বিভিন্ন ইস্যু, শ্রম অধিদপ্তর, বাংলাদেশ সরকার

সারণী ২.৭ : শ্রম আদালতের কাজের অবস্থা

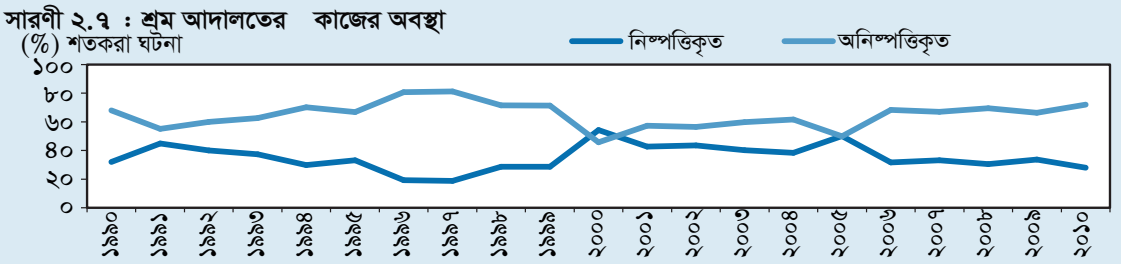

তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ লেবার জার্নাল, বিভিন্ন ইস্যু, শ্রম অধিদপ্তর, বাংলাদেশ সরকার

আদালতের এই দীর্ঘসূত্রতার নানা কারণ আছে, যার মধ্যে দুটি কারণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথমত, শ্রম আদালতের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। বর্তমানে দেশে সাতটি শ্রম আদালত আছে, যার মধ্যে তিনটি ঢাকাতে, আর বাকি চারটি বিভাগীয় শহরগুলোতে। নতুন যে আপিল আদালত হয়েছে, তার বেঞ্চ একটি, সেটা আবার ঢাকাতেই ।

দ্বিতীয়ত, শ্রম আদালতের গঠন সম্পর্কে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এ বলা হয়েছে, একজন চেয়ারম্যান ও দুজন সদস্য নিয়ে শ্রম আদালত গঠিত হয়েছে, যাদের একজন হবেন মালিকপক্ষের প্রতিনিধি, আরেকজন শ্রমিকপক্ষের।

তবে শ্রম আদালতের এই প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্র কিন্তু মজুরি পরিশোধের ক্ষেত্রে থাকে না। দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য, যে ক্ষেত্রে শুধু চেয়ারম্যানকে নিয়ে আদালত গঠিত হয়। সরকার কর্মরত জেলা ও অতিরিক্ত জেলা বিচারকদের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দিয়ে থাকে। এর কোনো প্রমাণ প্রক্রিয়া নেই, ফলে শাসক দলের রাজনৈতিক প্রভাব এখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু আদালতের সদস্যদের ভাতা অত্যন্ত কম হওয়ায় কেউ সাধারণত এতে যোগ দিতে চায় না। আবার মালিক ও শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধিদের অনুপস্থিতিতে প্রায়শই এই বিলম্ব হয়।

শ্রম আদালতে প্রবেশের আরেকটি বাধা হলো এর আওতা সম্পর্কে মানুষের অজ্ঞতা। পোশাক শ্রমিকদের বেশির ভাগই জানে না, মালিকপক্ষের সঙ্গে দ্বন্দ্ব হলে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া যায় কি না। কীভাবে মামলা করতে হয় সে বিষয়ে শ্রমিকদের ধারণা না থাকায় দালালেরা তার সুযোগ নেয়। ফলে শ্রমিকদের মামলাজনিত খরচ বেড়ে যায়। ফলে বিচারের সুযোগ পাওয়ার ক্ষেত্রে এই সমস্যার কারণে শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ আছে। তাঁদের অভিযোগ, আদালত সব সময় মালিকদের পক্ষপাতিত্ব করে। আর বিচারের রায় নির্ভর করে ঘুষ, পেশি শক্তি ও দুর্নীতির ধরনের ওপর।

স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিত্ব

তৈরি পোশাক খাতে অংশীদারিমূলক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থার কাজ হচ্ছে, বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ ও গোষ্ঠীর স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ একত্রিত করা এবং তাতে মধ্যস্থতা করা। বর্তমানে এই কাঠামোর তিনটি স্তর রয়েছে: ১) উদ্যোক্তা পর্যায়, ২) শিল্প পর্যায় ও ৩) জাতীয় পর্যায়। ট্রেড ইউনিয়নের রেজিস্ট্রারের হিসাব অনুসারে পোশাক শিল্পসহ বিভিন্ন শিল্পে ৩২ টি জাতীয় পর্যায়ের ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন কাজ করছে । শুধু পোশাকশিল্পে ২৩ টি ফেডারেশন আছে। এ ছাড়া ২০ টি বিভাগভিত্তিক গার্মেন্টস ফেডারেশন আছে ।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক গোষ্ঠী হচ্ছে ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ ট্রেড ইউনিয়ন-শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (স্কপ)। কারখানাভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়ন হলো ওই খাতের সমিতির মতো। রেজিস্টার অফ ট্রেড ইউনিয়নের রেকর্ড অনুসারে দেশে মাত্র ৩২৯ টি কারখানাভিত্তিক ইউনিয়ন আছে (যার মধ্যে ২০০টি গত দুই বছরে নিবন্ধিত হয়েছে)। এই কারখানাভিত্তিক ইউনিয়নগুলো ৩৬ টি জাতীয় ও বিভাগভিত্তিক গার্মেন্টস ফেডারেশনের সঙ্গে যুক্ত।

ইপিজেডেও গার্মেন্টস কারখানায় এখনো ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করা যায় না। এর বদলে শ্রমিকেরা গণভোটের ভিত্তিতে সমিতি গঠন করতে পারে। ঢাকা ও চট্টগ্রাম ইপিজেডের ২৬৪ টি প্রতিষ্ঠানে এখন পর্যন্ত ১৪৩ (ঢাকা-৫৪, চট্টগ্রাম-৮৯) টি সমিতি গড়ে উঠেছে। কারখানা পর্যায়ে এরকম সমিতির অপর্যাপ্ততার কারণে এই খাতের শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব করছে জাতীয় পর্যায়ের শিল্প ফেডারেশনগুলো।

এসব স্বার্থ সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীগুলোর বহুমুখিতা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলেও শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষেত্রে এর কিছু দুর্বলতা আছে। চারটি কারণে এটি ঘটে থাকে।

প্রথমত, ইউনিয়নগুলোর প্রতিনিধিত্ব না থাকার চরিত্র। সাংগঠনিকভাবে দুর্বল থাকার কারণে শ্রমিকেরা তাদের দাবিদাওয়া আদায় করতে পারে না।

দ্বিতীয়ত, শ্রমিক ইউনিয়নগুলোতে নারী সদস্যদের উপস্থিতি ব্যাপকভাবে না থাকা। শ্রমিক ইউনিয়নগুলোতে নারীদের উপস্থিতর হার মাত্র ১৬ শতাংশ (বিলস ২০০৯)।

তৃতীয়ত, শ্রমিক ইউনিয়নগুলো তাদের সদস্যদের নিয়ে রাজনৈতিকভাবে সংঘবদ্ধ। শ্রমজীবী মানুষের কোনো আদর্শ তারা ধারণ করে না। দেশে বহু জাতীয় ও শিল্পভিত্তিক ইউনিয়ন গঠিত হয়েছে কোনো ব্যক্তিবিশেষের রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করার উদ্দেশ্য নিয়ে।

চতুর্থত, শ্রমিক ইউনিয়নগুলো আর্থিক কারণে শ্রমিকদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না। বেশির ভাগ ইউনিয়নের গড় আয় খুবই কম এবং তা প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংগঠন চালানোর মতো যথেষ্ট নয়।

অপরপক্ষে শ্রমিকদের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা নেই এমন সব অসাংগঠনিক গোষ্ঠী বা সংগঠন শ্রমিকদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে অনেক বেশি । দাবিদাওয়া উত্থাপনের জন্য শ্রমিকদের কোনো আনুষ্ঠানিক চ্যানেল না থাকার কারণে এমনটা ঘটছে। পোশাক শ্রমিকদের জন্য যেসব সংগঠন রয়েছে সেগুলোর সাংগঠনিক কাঠামো খুবই দুর্বল এ ধরনের অসাংগঠনিক নিবন্ধনহীন গ্রুপের সংখ্যা এখন ৩০টিরও বেশি। যেমন: গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড ওয়ার্কার্স প্রোটেকশন অ্যালায়েন্স,

---

২. এই অপ্রতুলতা সরকারের কর্তৃত্বকে খর্ব করছে। শ্রম আইন-২০০৬ অনুসারে সরকারের তার প্রয়োজন অনুযায়ী যে কোন সংখ্যক শ্রম আদালত স্থাপনের ক্ষমতা রয়েছে। এ ছাড়া সঠিক কার্যকরিতার প্রয়োজনে বিভিন্ন বেঞ্চ গঠনে ট্রাইবুনালে যে কোন সংখ্যক সদস্য নিয়োগের ক্ষমতা সদস্য সরকারের রয়েছে (বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬, অনুচ্ছেদ ২১৪)।

. জাতীয় পর্যায়ের ফেডারেশন বেসিক ও ইন্ডাডিস্ট্রিয়াল ফেডারেশনের সমন্বয়ে তৈরী হয়। বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এর অনুচ্ছেদ ২০০(৫) অনুসারে,২০ টির কম নয় এমন সংখ্যক বিভিন্ন ইনডাস্ট্রিয়াল ইউনিয়ন একত্রিত হয়ে একটি ফেডারেশন গঠন করতে পারবে।

. বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এর অনুচ্ছেদ ২০০(১) অনুসারে (২০১৩ তে সংশোধিত) একই ধরণের বা একই প্রকারের শিল্পে নিয়োজিত বা শিল্প পরিচালনারত প্রতিষ্ঠানগুলোতে গঠিত পাঁচ বা ততোধিক ট্রেড ইউনিয়ন, যদি তাদের সাধারন সভায় এরূপ প্রস্তাব গৃহিত হয়, ফেডারেশনের দলিল সম্পাদন করে, কোন ফেডারেশন গঠন করতে এবং তা রেজিস্ট্রিকরণের জন্য দরখাস্ত করতে পারবে। বর্তমানে ১০৮ টি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফেডারেশন নিবন্ধিত রয়েছে।

গার্মেন্ট শ্রমিক সংগ্রাম পরিষদ ও গার্মেন্ট ওয়ার্কার্স ইউনিটি কাউন্সিল, শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরাম ইত্যাদি। এসব সংগঠন এমন সব সব ব্যক্তির সমন্বয়ে সংগঠিত হয়েছে যাদের একটি অভিন্ন স্বার্থ রয়েছে।

পোশাক খাতের শ্রমিকেরা যখন তাদের কোনো দাবি আদায়ের জন্য প্রতিবাদ বিক্ষোভ করে তখন অসাংগঠনিক এসব গোষ্ঠী তাদের সমর্থন জানায়। শ্রমিকদের অধিকার যদি দিনের পর দিন ক্ষুন্ন হতে থাকে, যেমন বেতন না দেওয়া, বেতন দিতে দেরি করা, ওভারটাইমের টাকা বকেয়া রাখা সব যখন দিনের পর দিন ঘটতেই থাকে তখন শ্রমিকদের মধ্যে ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটে। বিক্ষুব্ধ শ্রমিকেরা রাস্তায় নেমে আসে। এই বিক্ষোভ এক কারখানার শ্রমিকদের থেকে অন্য কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

শ্রমিক অসন্তোষ দূর করার জন্য কোনো কার্যকর পদ্ধতি না থাকায় শ্রমিকদের মনের মধ্যে ক্ষোভ জমতেই থাকে এবং কোনো একটি ঘটনায় এই ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটে। তখন বিক্ষোভ সমাবেশ, অবস্থান ধর্মঘট, সড়ক অবরোধের মতো ঘটনা ঘটে। শ্রমিকেরা মনে করে দাবি আদায়ের জন্য এসব পদ্ধতি বেশি কার্যকর।

তৈরি পোশাক খাতে ত্রিপক্ষীয় কমিটির প্রয়োজনীয়তা:

ত্রিপক্ষীয় কমিটি শ্রমিকদের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটা এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে শ্রমিক, নিয়োগকর্তা এবং সরকারের প্রতিনিধিত্ব থাকে এবং শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে ও তাদের অধিকার আদায়ের জন্য একসঙ্গে কাজ করে। এই প্রক্রিয়ায় আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সব সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করা হয়। ত্রিপক্ষীয় সহযোগিতাকে সংজ্ঞায়িত করা হয় সরকার, মালিক ও শ্রমিকদের প্রতিনিধির পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া হিসেবে। বিভিন্ন সমস্যা তারা একসঙ্গে বসে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের বেলায়ও এই তিন পক্ষ একসঙ্গে বসে আলোচনা করে। (আইএলও-২০১৩)

ত্রিপক্ষীয় ব্যবস্থায় সরকার এবং মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধিরা একত্রে কাজ করেন। এই ব্যবস্থায় ট্রেড ইউনিয়ন অথবা শ্রমিকদের দলগতভাবে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করতে উৎসাহিত করা হয়। এতে প্রাসঙ্গিক বিষয়ে সম্মতি আদায় করা সহজ হয়। ফলে ক্ষমতাকাঠামো উন্নততর করপোরেট ফলাফল অর্জন করতে পারে। এ ছাড়া ত্রিপক্ষীয় ব্যবস্থায় যেসব নীতি ও পদক্ষেপ গৃহীত হয়, তার গ্রহণযোগ্যতা বেশি থাকে, যা সহজভাবে বাস্তবায়ন করাও সম্ভব হয়।

ত্রিপক্ষীয় আলোচনার মাধ্যমে শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তি করা যায়। আগের আলোচনায় দেখানো হয়েছে, মজুরি, সুবিধাদি, কর্ম পরিবেশ, ক্ষতিপূরণ, হয়রানি, হঠাৎ বরখাস্ত এসব নিয়ে প্রায়শই সমস্যা সৃষ্টি হয়, যার মধ্যে অনেকগুলো ত্রিপক্ষীয় আলোচনার মাধ্যমে এসব সমাধান করা হয়েছে। দেখা গেছে, যেসব বিরোধ আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছে, তার মধ্যে ৯৫ শতাংশই সমাধান করা গেছে, সামান্য কিছু এখনো ঝুলে আছে। অন্যদিকে শ্রম আদালতের কার্যক্রম বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, মাত্র ৩৫ শতাংশ মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে, বাকিগুলো ঝুলে আছে। ফলে এটা পরিষ্কার, বিরোধ নিষ্পত্তিতে ত্রিপক্ষীয় ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ ছাড়া এর মাধ্যমে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক রূপান্তরও অনায়াসে করা সম্ভব হয়। সংকটের প্রভাব দূরীকরণে এটি জরুরি। সর্বোপরি, ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি এবং বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৩. শ্রম খাতে ত্রিপক্ষীয় ব্যবস্থার বর্তমান অবস্থা

জাতীয় ও কারখানা পর্যায়ে ত্রিপক্ষীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে বৈরিতামুক্ত শিল্প সম্পর্কের ভিত্তি স্থাপন করা যায়। সময়-সময় বিভিন্ন শ্রম বাজারের বিভিন্ন বিষয় আমলে নিতে নানা ত্রিপক্ষীয় কমিটি ও ফোরাম গঠন করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) রীতি অনুসমর্থন করার মধ্য দিয়ে এই ত্রিপক্ষীয় ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক ভিত রচনা করা হয়েছে, যার লক্ষ্য হচ্ছে ১৯৭৬ সালের আন্তর্জাতিক শ্রম মান বাস্তবায়ন করা, যদিও এটি গৃহীত হয় ১৯৭৯ সালে।

এই অংশে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতের ত্রিপক্ষীয় ব্যবস্থার বর্তমান অবস্থা কী, তা অনুসন্ধান করা হয়েছে। এটা করতে গিয়ে তৈরি পোশাক খাতের বিদ্যমান ত্রিপক্ষীয় ফোরাম কাঠামো বিশ্লেষণ করা হয়েছে, তার কার্যক্রম, সমন্বয় ব্যবস্থা, অর্জন ও চ্যালেঞ্জগুলোও একই সঙ্গে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে তৈরি পোশাক খাতকে আরও বৈরিতামুক্ত করতে ত্রিপক্ষীয় কাঠামোতে পরিবর্তন আনা দরকার কি না, তা খতিয়ে দেখা হয়েছে। ফোরামের বর্তমান কাঠামো, তার কার্যাবলি, সমন্বয় প্রক্রিয়া, এর অর্জন ও চ্যালেঞ্জগুলো খতিয়ে দেখা হয়েছে। তার জন্য প্রতিবেদনের পর্যালোচনা, বৈঠকের কার্যবিবরণী, সরকারের গেজেট ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের বর্তমান ত্রিপক্ষীয় ফোরামের কাঠামো

বাংলাদেশে তিনটি নিয়মিত ত্রিপক্ষীয় প্রতিষ্ঠান আছে, যার সঙ্গে তৈরি পোশাক খাত ও অন্যান্য শিল্প খাতের সম্পর্ক আছে।

এই তিনটি প্রতিষ্ঠান হচ্ছে (ক) ট্রাইপারটাইট কনসালটেটিভ কাউন্সিল(টিসিসি), (খ) মিনিমাম ওয়েজ বোর্ড (এমডব্লিউবি), (গ) ন্যাশনাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেফটি অ্যান্ড হেলথ কাউন্সিল।

এ ছাড়া উল্লিখিত লক্ষ্যে কিছু অ্যাডহকভিত্তিক ত্রিপক্ষীয় ফোরাম আছে। উল্লেখ্য, সরকার কখনো কখনো নির্দিষ্ট কিছু বিরোধ নিষ্পন্ন করার জন্য কমিটি গঠন করে থাকে, যেমন তুবা গার্মেন্টস (ঘটনা ১) ও সোয়ান গার্মেন্টস (ঘটনা ২)।

ঘটনা ১:

তুবা গার্মেন্টসের ঘটনায় বোঝা যায়, কর্মস্থলে সহযোগিতা প্রক্রিয়া না থাকলে একটি কারখানার শ্রমিকদের মজুরি নিয়ে সৃষ্ট অসন্তোষ কীভাবে জাতীয় ব্যাপারে পরিণত হয় এবং তৈরি পোশাক খাতে ব্যাপক অসন্তোষ সৃষ্টির জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। তাজরীন ও তুবা গার্মেন্টসের মালিক একই ব্যক্তি, ফলে তাজরীন গার্মেন্টসে আগুন লাগার পর তুবা গার্মেন্টস কার্যাদেশ পায়নি। জানুয়ারি থেকে জুন মাস পর্যন্ত তারা বিশ্বকাপ ফুটবলের জার্সি বানিয়েছে। এটা সহ অন্যান্য পোশাক বিক্রি করে তারা ৩৯ কোটি টাকা আয় করে। কিন্তু গত মাসাধিককাল ধরে তারা শ্রমিকদের মজুরি দেয়নি। এই সমস্যা সমাধানে পার্টিসিপেশন কমিটি (অংশগ্রহণ কমিটি) দুই বা তিনবার বৈঠকে বসে। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কথা দেয়, শিগগিরই শ্রমিকদের মজুরি পরিশোধ করা হবে। কিন্তু শ্রমিকেরা তো আর বকেয়া মজুরি পায় না। পার্টিসিপেশন কমিটির শ্রমিক প্রতিনিধিরা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করতে ব্যর্থ হয়, আবার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কমিটির কথা অগ্রাহ্য করে। এতে শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। সামনেই ছিল ঈদ, ফলে শ্রমিকেরা বোনাসসহ বেতন দাবি করে ধর্মঘটসহ আমৃত্যু অনশনের মতো কর্মসূচি ঘোষণা করে।

ঘটনা ২

সোয়ান গ্রুপের দুটি কারখানায় ১৩০০ শ্রমিক কাজ করলেও সেখানে পার্টিসিপেশন কমিটি, ওএইচএস কমিটি বা ক্যানটিন ম্যানেজমেন্ট কমিটির মতো সহযোগিতার বন্দোবস্ত ছিল না। এই কারখানার শ্রমিকেরা তত্ত্বাবধায়ক ও লাইন প্রধানের মাধ্যমে ব্যক্তিগত ও কর্মস্থলের সমস্যা সমাধান করত। মালিকানার দ্বন্দ্বে শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনা না করেই কারখানা দুটি ২০১৫ সালের ১০ এপ্রিল বন্ধ ঘোষণা করা হয়, এমনকি তাদের মজুরি ও বোনাস দেওয়া হয়নি। সেখানে সহযোগিতা ব্যবস্থা না থাকায় শ্রমিকেরা অন্য সূত্র থেকে জানতে পারে, কারখানা বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু তারা জানত না, কীভাবে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করা যায়। কারখানা বন্ধ হয়ে গেলে তারা বকেয়া মজুরি ও বোনাসের দাবিতে অবস্থান ধর্মঘটসহ প্রতিবাদ মিছিল, সড়ক অবরোধ, আমরণ অনশন প্রভৃতি কর্মসূচি পালন করে।

এই কমিটিগুলো একদম অ্যাডহক প্রকৃতির, নিয়মিত নয়। নিচের সারণিতে দেশের তৈরি পোশাক খাতে বিদ্যমান ত্রিপক্ষীয় ফোরাম ও প্রতিষ্ঠানের তালিকা দেওয়া হলো (ছক-৩.১)। বিদ্যমান ১০ টি ফোরামের মধ্যে শুধু ন্যূনতম মজুরি বোর্ড একমাত্র আইনি ত্রিপক্ষীয় ফোরাম। ট্রাইপারটাইট কনসালটেটিভ কাউন্সিল(টিসিসি) আইএলও কনভেনশনের ১৪৪ নম্বর ধারা অনুসারে গঠিত হয়েছে, আর বাকিগুলো গঠিত হয়েছে সরকারের অরডিন্যান্স ও সরকারের বিজ্ঞপ্তি দ্বারা।

কাজের সময়

স্বাধীনতার পর দেশে প্রথম যে ত্রিপক্ষীয় প্রতিষ্ঠান গঠিত হয় তা হলো 'ন্যাশনাল লেবার অ্যাডভাইজরি বোর্ড'। তখন এতে ১০ জন সরকারি প্রতিনিধি এবং প্রত্যেক মালিক ও শ্রমিক

সংগঠনের পাঁচজন সদস্য ছিল। ত্রিপক্ষীয় আলোচনা সংক্রান্ত আইএলওর কনভেনশন অনুসমর্থনের মধ্য দিয়ে 'ন্যাশনাল লেবার অ্যাডভাইজরি বোর্ড' ট্রাইপারটাইট কনসালটেটিভ কাউন্সিলে(টিসিসি) রূপান্তরিত হয়। ২০০৯ সালের মার্চ মাসে এটি পুনর্গঠিত হয়।

আনুষ্ঠানিকভাবে এই ত্রিপক্ষীয় আলোচনার ধারা শুরু হয় গত দশক থেকে। দেখা গেল, বিদ্যমান ১০ টি ত্রিপক্ষীয় ফোরামের মধ্যে শুধু দুটি অর্থাৎ টিসিসি ও ন্যাশনাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেফটি অ্যান্ড হেলথ কাউন্সিল ২০০০ সালের আগে গঠিত হয়েছে। ২০০৭ সালে সংকট ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত হয়। এরপর ২০০৫ সালে গঠিত হয় সোশ্যাল কমপ্লায়েন্স ফোরাম, শ্রমিক কল্যাণ ও কর্মস্থলের নিরাপত্তা বিষয়ক দুটি টাস্কফোর্স ও একটি কমপ্লায়েন্স মনিটরিং সেল । ন্যাশনাল ট্রাইপারটাইট কমিটি ফর দ্য ফায়ার অ্যান্ড বিল্ডিং সেফটি ও রানা প্লাজা কোঅরডিনেশন কমিটি(আরপিসিসি) গঠিত হয় ২০১৩ সালে।

(ছক-৩.১) পোশাকশিল্পে কার্যরত বর্তমান ত্রিপক্ষীয় ফোরাম

ক্রমিক	কমিটির নাম	কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব	নেতৃত্ব
১.	ট্রাইপারটাইট কনসালটেটিভ কমিটি (টিসিসি)	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	শ্রম মন্ত্রী
২.	মিনিমাম ওয়েজ বোর্ড (এমডব্লিউবি)	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	চেয়ারম্যান (জেলা জজ)
৩.	ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিটি	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	যুগ্ম সচিব
৪.	সোশ্যাল কমপ্লায়েন্স ফোরাম ফর আরএমজি (এসসিএফ)	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	বাণিজ্য মন্ত্রী
৫.	টাস্কফোর্স অন লেবার ওয়েলফেয়ার ইন আরএমজি	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
৬.	টাস্কফোর্স অন অকুপেশনাল সেফটি ইন আরএমজি	গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	যুগ্ম সচিব, গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
৭.	ন্যাশনাল ট্রাইপারটাইট কমিটি ফর দ্য ফায়ার অ্যান্ড বিল্ডিং সেফটি ইন আরএমজি সেক্টর	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
৮.	রানা প্লাজা কোঅরডিনেশন সেল (আরপিসিসি)	আইএলও	আইএলও
৯.	ন্যাশনাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেফটি অ্যান্ড হেলথ কাউন্সিল	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	যুগ্ম সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

(ছক-৩.২) ত্রিপক্ষীয় ফোরামের সদস্যদের মর্যাদা

কমিটির নাম	সদস্য	প্রতিনিধিত্বের মর্যাদা
ট্রাইপারটাইট কনসালটেটিভ কাউন্সিল (টিসিসি)	৬০	সরকার, মালিক ও শ্রমিক সংগঠন থেকে ২০ জন করে
মিনিমাম ওয়েজ বোর্ড(এমডব্লিউবি)	৬	চেয়ারম্যান ১ জন, স্বাধীন সদস্য ১ জন, মালিকদের ২ জন প্রতিনিধি ও শ্রমিকদের ২ জন
ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিটি	১০	চেয়ারম্যান ১ জন এবং সরকার, মালিকপক্ষ ও শ্রমিকপক্ষ থেকে ৩ জন করে
সোশ্যাল কমপ্লায়েন্স ফোরাম ফর আরএমজি (এসসিএফ)	৩১	সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের ১৫ জন, শ্রমিক সংগঠন ৪ জন, মালিকপক্ষের ৪ জন, এনজিওর ৩ জন, আন্তর্জাতিক সংগঠনের ২ জন
টাস্কফোর্স অন লেবার ওয়েরফেয়ার ইন আরএমজি	১১	চেয়ারম্যান ১ জন, সরকারের ৫ জন, মালিকপক্ষের ৩ জন, শ্রমিক সংগঠনের ২ জন
টাস্কফোর্স অন অকুপেশনাল সেফটি ইন আরএমজি	১৪	চেয়ারম্যান ১ জন, সরকারের ৭ জন, মালিকপক্ষের ৪ জন, শ্রমিক সংগঠনের ২ জন
ন্যাশনাল ট্রাইপারটাইট কমিটি ফর দ্য ফায়ার অ্যান্ড বিল্ডিং সেফটি ইন আরএমজি সেক্টর	১৬	চেয়ারম্যান ১ জন, সরকার, মালিক ও শ্রমিকপক্ষের ৫ জন করে
রানা প্লাজা কোঅরডিনেশন সেল (আরপিসিসি)	১২	নিরপেক্ষ চেয়ারম্যান আইএলও এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বিজিএমইএ, বিইএফ, এনসিসিডব্লিউই, ইন্ডাস্ট্রি অল বিডি কাউন্সিল, বিল্‌স, ইন্ডাস্ট্রিঅল গ্লোবাল ইউনিয়ন ও নির্ধারিত ব্র্যান্ডের প্রতিনিধি (বোনমার্শে, এল কোর্টে ইঙ্গলস, লোবল, প্রাইমার্ক), ক্লিন ক্লথস ক্যাম্পেইন
ন্যাশনাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেফটি অ্যান্ড হেলথ কাউন্সিল	২২	চেয়ারপারসন ১ জন ও সরকার, শ্রমিক ও মালিক সংগঠনের ৭ জন করে প্রতিনিধি

ফোরামের সদস্য

ত্রিপক্ষীয় সংগঠনগুলো মূলত তিন পক্ষের প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত হয়: সরকার, শ্রমিক ও মালিক সংগঠন। এসব ফোরামের সদস্য সংখ্যা সব ক্ষেত্রে সমান হয় না, কিন্তু অধিকাংশ ফোরামে সরকার, শ্রমিক ও মালিক পক্ষের সমান প্রতিনিধিত্ব থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, টিসিসির সদস্য সংখ্যা ৬০, যার মধ্যে ২০ জন সরকারের, ২০ জন শ্রমিক ও ২০ জন মালিক পক্ষের প্রতিনিধি। অন্যদিকে ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিটির সদস্য সংখ্যা ১০, যার মধ্যে একজন চেয়ারপারসন এবং বাকি নয়জনের মধ্যে সরকার, মালিক ও শ্রমিক পক্ষেও প্রতিনিধি ৩ জন করে। মিনিমাম ওয়েজ বোর্ড বা ন্যূনতম মজুরি বোর্ডের সদস্য সংখ্যা ছয়, যেখানে একজন থাকেন চেয়ারম্যান, একজন স্বাধীন সদস্য, মালিকপক্ষের দুইজন (একজন স্থায়ী, আরেকজন সংশ্লিষ্ট শিল্পের) ও শ্রমিকপক্ষের দুজন প্রতিনিধি (একজন স্থায়ী, আরেকজন সংশ্লিষ্ট শিল্পের)।

সোশ্যাল কমপ্লায়েন্স ফোরামের সদস্য সংখ্যা ২৫, যার মধ্যে বিনিয়োগ বোর্ড, বাণিজ্য, স্বরাষ্ট্র, টেক্সটাইল, শিল্প, গণপূর্ত, নারী ও শিশু সচিব, বেপজা, ইপিবি, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, শ্রম মন্ত্রণালয়, বিজিএমইএ, বিকেএমইএ, বাংলাদেশ টেরি টাওয়েল অ্যান্ড লিনেন ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিটিটিএলএমইএ) , বাংলাদেশ ইনডিপেনডেন্ট গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ফেডারেশন, শ্রমিক, বিজনেস সোশ্যাল কমপ্লায়েন্স ইনিশিয়েটিভ, নারী উদ্যোগ কেন্দ্র (এনইউকে), কর্মজীবী নারী, ইউএনডিপি, জিআইজেড, আইএলও ও এলসিজির প্রতিনিধিত্ব আছে। ছকের (৩.২) নিচে বিদ্যমান ত্রিপক্ষীয় ফোরামের সদস্যদের মর্যাদা দেখানো হয়েছে।

কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব

অধিকাংশ ত্রিপক্ষীয় ফোরাম যেমন, ট্রাইপারটাইট কনসালটেটিভ কাউন্সিল(টিসিসি), মিনিমাম ওয়েজ বোর্ড (এমডব্লিউবি), ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিটি ফর দ্য ফায়ার অ্যান্ড বিল্ডিং সেফটি এন আরএমজি সেক্টর শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে কাজ করে। বাকিগুলোর মধ্যে তিনটি অর্থাৎ সোশ্যাল কমপ্লায়েন্স ফোরাম ফর আরএমজি, টাস্কফোর্স অন লেবার ওয়েলফেয়ার ইন আরএমজি ও কমপ্লায়েন্স মনিটরিং সেল বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে কাজ করে। দ্য টাস্কফোর্স অন অকুপেশনাল সেফটি ইন আরএমজি, রানা প্লাজা কোঅরডিনেশন কমিটি ও ন্যাশনাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেফটি অ্যান্ড হেলথ কাউন্সিল যথাক্রমে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, আইএলও ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে কাজ করে(দেখুন ছক-৩.১)।

ফোরামের বর্তমান অবস্থা

বর্তমানে ফোরামের কার্যক্রম চলছে, কিন্তু তার ফল সব ক্ষেত্রে সমান নয়। নিয়মিতভাবে বৈঠক হয় না, আবার সদস্যদের অংশগ্রহণ সব সময় না থাকায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে দেরি হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিটির প্রতি দুই মাসে একবার বৈঠক করার কথা। কিন্তু তারা বছরে দুই বা তিনবার বৈঠক করছে, গুরুত্বপূর্ণ এক সূত্রে এই তথ্য পাওয়া গেছে।

ত্রিপক্ষীয় ফোরামের কাজ

শিল্প খাতের ত্রিপক্ষীয় ফোরামের কাজ হলো, শ্রম সম্পর্কিত নানা বিষয়াদি পাঠ ও অনুসন্ধান করা এবং সংশ্লিষ্ট শিল্পের শ্রম বিষয়ক সমস্যাগুলো আলোচনা করা, যার লক্ষ্য হচ্ছে, শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে ভালো বোঝাপড়া নিশ্চিত করা। এসব সমস্যা সমাধানে সরকারকে সুপারিশ করা এবং সকল পক্ষের জন্য কার্যকর সূত্র প্রণয়ন করা। যেহেতু তৈরি পোশাক খাতে এই ত্রিপক্ষীয় ফোরাম নানা নানা ইস্যু কেন্দ্র করে গঠিত হয়, সেহেতু তাদের কাজ ভিন্ন। কিন্তু তাদের কাজের প্রকৃতি ভিন্ন। এটা পরিষ্কার, প্রতিটি কমিটির সদস্য একত্রে বৈঠক করেন এবং দায়িত্ব পালন করার জন্য নানা কর্মপরিকল্পনা করেন। বৈঠকে অংশগ্রহণকারী বা কমিটির সদস্যরা গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনে যথাযথ পদক্ষেপের ব্যাপারে সুপারিশ করেন। বৈঠকের কার্যবিবরণী লিখে সদস্যদের মাঝে বিতরণ করা হয়।

কিছু ফোরামের সুনির্দিষ্ট কাজ এরূপ:

- টিসিসির বৈঠকে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ নানা বিষয়াদি যেমন, শ্রম নীতি প্রণয়ন, বিদ্যমান শ্রম আইনের সংশোধন, আইএলও ও সরকারের কনভেনশন ও সুপারিশ গ্রহণ, শিল্প সম্পর্কের উন্নয়ন ইত্যাদি নানা বিষয় আলোচিত হয়ে থাকে। এখন পর্যন্ত টিসিসি নানা আইন সংশোধনের সম্ভাব্যতা যাচাই করেছে। টিসিসি আইএলওর কনভেনশন ও সুপারিশের সঙ্গে দেশের বিদ্যমান আইন ও রীতি মিলিয়ে দেখে এবং তা অনুসমর্থনের ব্যাপারে সরকারকে সুপারিশ করে।
- রানা প্লাজা কোঅরডিনেশন কমিটির কাজ হচ্ছে, রানা প্লাজা দুর্ঘটনার ভুক্তভোগী, তাদের পরিবার ও নির্ভরশীলদের স্বচ্ছতা ও ন্যায্যতার সঙ্গে ক্ষতিপূরণ দেওয়া। আন্তর্জাতিক শ্রম মানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তারা একটি স্বাধীন ও সমন্বিত প্রক্রিয়া গড়ে তুলতে চায়।
- মিনিমাম ওয়েজ বোর্ড বিভিন্ন খাতের শ্রমিকের জন্য মজুরি হার সুপারিশ করে, যদি মালিক বা শ্রমিক বা উভয় পক্ষ ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের আবেদন করে, তাহলে তারা এটি করে থাকে। ওয়েজ বোর্ড নির্দেশনা পাওয়ার ছয় মাসের মধ্যে এই সুপারিশ করে(ওয়েজ বোর্ড

অনুরোধ করলে সরকার এই সময় বাড়াতে পারে)। সরকারের নির্দেশনা ক্রমে যেকোনো শিল্পের ন্যূনতম মজুরি পাঁচ বছর অন্তর পুনঃ নির্ধারিত হতে পারে।

- তৈরি পোশাক খাতে সোশ্যাল কমপ্লায়েন্স ফোরাম কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা, কর্মসময়, সাপ্তাহিক ছুটি ও শ্রমিক কল্যাণের মতো বিষয়গুলো যথাযথভাবে মেনে চলা হচ্ছে কি না, তা নিশ্চিত করে।
- দ্য টাস্কফোর্স অন লেবার ওয়েলফেয়ার ইন আরএমজি সামাজিক সম্মতি মেনে চলার ক্ষেত্রে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি কর্মপরিকল্পনা করে থাকে: ক) সকল ধরনের বৈষম্য বিলোপ, খ) জোরপূর্বক শ্রম বিলোপ, গ) সকল ধরনের হয়রানি ও প্রবঞ্চনার বিলোপ, ঘ) শিশু শ্রম মুক্ত পরিবেশ ঙ) শ্রমিকদের নিয়োগপত্র দেওয়া, চ) যৌক্তিক কর্মসময়, ছ) স্বাস্থ্য ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, জ) সংগঠন ও সিবিএ করার অধিকার।
- দ্য টাস্কফোর্স অন অকুপেশনাল সেফটি ইন আরএমজিও স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। নিরাপত্তার চারটি দিক তারা শ্রেণিবিন্যাস করেছে অগ্নি নিরাপত্তা, ভবন নিরাপত্তা, পরিবেশ নিরাপত্তা এবং সুরক্ষা ও নিরাপত্তা।
- রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর মধ্যে কমপ্লায়েন্স মনিটরিং সেল গঠন করার কারণ হচ্ছে, দেশের তৈরি পোশাক খাতে কল্যাণ ও কর্মপরিবেশ উন্নয়ন করা। এই সেলের সুনির্দিষ্ট কাজ এরূপ: ক) 'সোশ্যাল কমপ্লায়েন্স ফোরাম ফর আরএমজি'-কে সাচিবিক সহায়তা প্রদান এবং কমপ্লায়েন্সের(যেসব ব্যাপারে সামাজিক সম্মতি আছে) ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট টাস্কফোর্স গঠন, খ) টাস্কফোর্সের প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা এবং 'সোশ্যাল কমপ্লায়েন্স ফোরাম ফর আরএমজি'-এর কাছে প্রতিবেদন পাঠানো, গ) কমপ্লায়েন্সের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক ক্রেতা গোষ্ঠীর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা, ঘ) তৈরি পোশাক উৎপাদন ও রপ্তানি প্রক্রিয়ায় যারা জড়িত আছে, সামাজিক কমপ্লায়েন্সের ব্যাপারে তাদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি, ঙ) বহির্বিশ্বে ভাবমূর্তি নির্মাণের ব্যাপারে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে সুপারিশ করা, চ) কমপ্লায়েন্স ও নিরাপত্তার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অংশীজন ও আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করা এবং তাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা, ছ) তৈরি পোশাক খাতের তথ্যভান্ডার নির্মাণ(মালিকানা, স্থান, উৎপাদিত পণ্য, উৎপাদন সক্ষমতা ও কর্মী সংখ্যা), জ) 'সোশ্যাল কমপ্লায়েন্স ফোরাম ফর আরএমজি' যেসব কাজের পরামর্শ দেয়, তা সম্পাদন করা (রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, ২০১৬)।
- ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিটির কাজ হলো, তৈরি পোশাক খাতে শ্রমিক অসন্তোষ ও অস্থিতিশীলতা প্রতিহত করা। শিল্পে বা শ্রম ঘন এলাকায় বিরোধ সৃষ্টি হলে এই কমিটি শ্রমিক, মালিক ও তাদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করে তা সমাধান করে। তারা আঞ্চলিক ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিটিকেও উপদেশ দেয়। আটটি আঞ্চলিক ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিটি আছে, যারা স্থানীয় পর্যায়ে মালিক ও শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনা করে শ্রমিক অসন্তোষ ও অস্থিতিশীলতা এড়ানোর চেষ্টা কওে (শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ২০১৪)।
- তৈরি পোশাক খাতের ন্যাশনাল ট্রাইপারটাইট কমিটি(এনটিসি) ফর ফায়ার অ্যান্ড বিল্ডিং সেফটির কাজ হচ্ছে, এই খাতে ন্যাশনাল ট্রাইপারটাইট প্ল্যান অফ অ্যাকশন (এনটিপিএ) এর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করা। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিবের নেতৃত্বে এই কমিটিকে সহায়তা করার জন্য একটি দল গঠন করা হয়েছে। তাজরীন গার্মেন্টসে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় এই এনটিপিএ গঠন করা হয়েছে, যার লক্ষ্য হচ্ছে, কর্মস্থলে অগ্নিকাণ্ড বা অনুরূপ ঘটনায় যাতে আর কোনো জীবন ও অঙ্গহানি, সম্পদ ধ্বংস প্রভৃতি না ঘটে।

বিভিন্ন ফোরামের সমন্বয় পদ্ধতি এবং সহযোগিতামূলক আয়োজন

তৈরি পোশাক খাতে ন্যূনতম ত্রিপক্ষীয় একাধিক ফোরাম সমন্বয়ের ক্ষেত্রে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করেছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এই ধারা অনুসরণ করেছে। গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং শ্রম মন্ত্রণালয় তৈরি পোশাক খাতে যথাক্রমে পেশাগত নিরাপত্তায় টাস্কফোর্স এবং ন্যাশনাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেফটি অ্যান্ড হেলথ কাউন্সিল সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করেছে। রানা প্লাজা ধসের পরবর্তী তৎপরতা সমন্বয়ের কাজে আইএলও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তা ছাড়া বাংলাদেশ সরকার আইএলওকে ন্যাশনাল ট্রাইপারটাইট প্ল্যান অব অ্যাকশন (এনপিপিএ) সমন্বয় ও বাস্তবায়নে সহযোগিতা করতে বলেছে।

অধিকাংশ ফোরামে সমন্বয় কার্যপদ্ধতির বিস্তারিত উল্লেখ নেই। ফলে বিভিন্ন ফোরামের মধ্যে সমন্বয়ের কাজটা মূলত অ্যাড-হক ভিত্তিতে এবং অনিয়মিতভাবে সম্পাদিত হয়। ত্রিপক্ষীয় ফোরামগুলোর মাসিক সভায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে চিঠি দিয়ে আমন্ত্রণ জানানো, প্রতিবেদন লেখা এবং প্রতিবেদন বিতরণ করা হয়। বিভিন্ন ফোরামের বৈঠক অনুষ্ঠানের হার অনিয়মিত এবং কখনো কখনো ফোরামের সব সদস্যকে ঠিকমতো সভার ব্যাপারে জানানো হয় না। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির বৈঠক প্রতি তিন মাস অন্তর আয়োজন করা উচিত। তবে সাধারণত সেটা শিল্প-কারখানায় বিরোধ দেখা দেওয়ার পরেই অনুষ্ঠিত হয়।

বিভিন্ন ফোরামের মধ্যে সমন্বয়ের অভাবও নজরে পড়ে। যেমন: কমপ্লায়েন্স মনিটরিং সেলের সদস্যরা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি বা তৈরি পোশাক খাতের শ্রমিক কল্যাণ টাস্কফোর্সের কার্যক্রম সম্পর্কে কদাচিৎ অবহিত থাকেন।

অর্জন ও প্রতিবন্ধকতাসমূহ

কয়েকটি কমিটি ত্রিপক্ষীয় আলোচনার মাধ্যমে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য অর্জন সম্ভব করে দেখিয়েছে। যেমন: ন্যূনতম মজুরি বোর্ড ৪২টি খাতের জন্য সর্বনিম্ন মজুরি নির্ধারণ করে দিয়েছে। এসবের মধ্যে পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম বেতন ৭৬ দশমিক সাত শতাংশ বৃদ্ধিও বিষয়টিও আছে। ২০০৬ সালের শ্রম আইন (২০১০ ও ২০১৩ সালে সংশোধিত) এবং বিভিন্ন নীতি যেমন: জাতীয় শ্রম নীতি, শিশুশ্রম নীতি, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নীতি ইত্যাদি টিসিসির ত্রিপক্ষীয় আলোচনার ভিত্তিতে প্রণীত হয়েছে। আইএলও সনদ এবং সরকারের বিভিন্ন সুপারিশ বাস্তবায়নের ব্যাপারেও টিসিসি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। রানা প্লাজা দুর্ঘটনায় হতাহত লোকজন এবং তাঁদের ওপর নিভ্রশীল পরিবারের সদস্যদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কাজে আরপিসিসি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

তবে সবগুলো ত্রিপক্ষীয় ফোরাম যে ঠিকমতো কাজ করছে না এবং সংগঠন চালাতে গিয়ে বিভিন্ন বাধার মুখে পড়ছে, এটা স্পষ্ট। সাক্ষাৎকারদাতা কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বলেছেন, সঠিক তদারকি এবং সমন্বয়ের অভাবই এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্যা। আরেকটি বাধা হচ্ছে সরকারের আধিপত্য এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো ত্রিপক্ষীয় ফোরামগুলোর কর্মীসংখ্যা অপর্যাপ্ত এবং তাঁদের দক্ষতার ঘাটতি আছে। অনমনীয় কাঠামো এবং কৌশলগত সহযোগিতার অভাবও এ ক্ষেত্রে বাধা হিসেবে কাজ করে। সভায় অংশগ্রহণের ব্যাপারে কারখানা মালিকপক্ষের মনোনীত প্রতিনিধিদের সদিচ্ছার অভাবও কখনো কখনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বাধা হিসেবে কাজ করে।

একটি জাতীয় দৈনিক সংবাদপত্রের প্রতিবেদন অনুযায়ী বিজিএমইএ এবং বিকেএমইএর মধ্য-পর্যায়ের কর্মকর্তারা পরিচালক বা শীর্ষ পরিষদের সদস্যদের পরিবর্তে তৈরি পোশাক খাতে শ্রমিক কল্যাণ ও পেশাগত নিরাপত্তা বিষয়ক সরকারি টাস্কফোর্সের বিভিন্ন বৈঠকে অংশ নেন। এ ধরনের মধ্যম সারির কর্মকর্তারা সিদ্ধান্ত দিতে পারেন না, বরং বারবার সময় চেয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন বিলম্বিত করেন (ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৪)। টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব ফয়জুর রহমান ওই প্রতিবেদককে বলেন, 'বিভিন্ন সভায় মনোনীত পরিচালকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে আমরা বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ কর্তৃপক্ষকে বেশ কয়েকবার লিখিতভাবে বলেছি। কিন্তু তাঁরা ইতিবাচক সাড়া দিচ্ছেন না।'

একটি সমন্বয়পূর্ণ শিল্প-সম্পর্কের জন্য যেসব কাঠামোগত পরিবর্তন প্রয়োজন

বাংলাদেশে বর্তমানে অন্তত ১০টি ত্রিপক্ষীয় ফোরাম সক্রিয় রয়েছে। তবে টিসিসি এবং ন্যূনতম মজুরি বোর্ড ছাড়া বাকি ফোরামগুলোর তৈরি পোশাক খাতে সমন্বয়পূর্ণ শিল্প-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কোনো অর্থবহ অর্জন নেই। অধিকাংশ ত্রিপক্ষীয় ফোরাম প্রায় নিষ্ক্রিয় অথবা কদাচিৎ নিজেদের দায়িত্ব পালন করে থাকে।

আইনি বৈধতার বিচার করলে দেখা যায়, কেবল ন্যূনতম মজুরি বোর্ডের আইনি ভিত্তি আছে। ত্রিপক্ষীয় আলোচনা পরিষদ (টিসিসি) আইএলও সনদ (১৪৪ নম্বর) অনুমোদনের মাধ্যমেই গঠন করা হয়েছিল। আর বাকিগুলো সরকারি অনুমোদন নিয়ে প্রতিষ্ঠা করা হয়। অতএব এটা সুস্পষ্ট যে সুনির্দিষ্টভাবে তৈরি পোশাক খাতের জন্য গঠিত কোনো ত্রিপক্ষীয় ফোরাম বা প্রতিষ্ঠানের আইনি ভিত্তি নেই। টিসিসি এবং এমডব্লুউবি ছাড়া বাকি ফোরামগুলো অস্থায়ী বা অ্যাড-হক ভিত্তিতে কাজ করছে এবং সেগুলো মূলত কোনো ঘটনা বা দুর্ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ পরিস্থিতিতে গঠন করা হয়েছিল।

ফোরামগুলোর কার্যক্রম বিষয়ভিত্তিক এবং বিচ্ছিন্ন। এসব ফোরামের মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি আছে। একটা কমিটি অন্যান্য কমিটির কার্যক্রম সম্পর্কে জানে না। কখনো কখনো এক ফোরামের কার্যক্রমে আরেক ফোরামের কাজে বিঘ্ন ঘটে এবং সদস্যদের ক্ষেত্রেও এ ধরনের ঘটনা দেখা যায়। কমিটিগুলোতে শ্রমিক প্রতিনিধি নির্বাচনের সুনির্দিষ্ট মাপকাঠির উল্লেখ করা হয়নি।

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, সমন্বয়পূর্ণ শিল্প ও শ্রমিক সম্পর্কের জন্য কাঠামোগত কিছু পরিবর্তন দরকার। এগুলো আইনি বৈধতা থেকে শুরু করে আওতা, প্রতিনিধিত্ব এবং কর্তৃপক্ষের ভূমিকা প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করতে হবে। ফোরামের সঙ্গে মিল রেখে এসব পরিবর্তন সাধন করতে হবে যাতে করে ফোরামগুলো শক্তিশালী আইনি বৈধতা পায় এবং সত্যিকারের প্রতিনিধিত্বমূলক পরিকাঠামোর আওতায় আসে এবং একই সঙ্গে একটি সমন্বয়পূর্ণ শিল্প ও শ্রমিক সম্পর্কেও জন্য বড় পরিসরে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা অর্জন করতে পারে।

৪. ত্রিপক্ষীয় একটি ফোরামের স্থায়ী কাঠামো গঠনের পথে

সমন্বয়পূর্ণ শিল্প ও শ্রম সম্পর্কের জন্য কাঠামোগত চাহিদার ভিত্তিতে একটি ত্রিপক্ষীয় ফোরামের স্থায়ী কাঠামোর প্রস্তাব করা হয় যাতে এটির গঠন, আওতা, বৈধতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক কর্মপদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত থাকবে। বাংলাদেশে তৈরি পোশাক খাতের জন্য একটি স্থায়ী ত্রিপক্ষীয় ফোরাম গঠনের যৌক্তিকতা এই লেখার পূর্ববর্তী অংশে বিশদ আলোচিত হয়েছে। এ রকম ফোরাম গঠনের একটা সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য আছে। শ্রমিক সংগঠনগুলোর (ট্রেড ইউনিয়ন) প্রতিনিধিরা তৈরি পোশাক খাতের জন্য নতুন স্থায়ী ত্রিপক্ষীয় ফোরাম প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব সম্পর্কে একমত হয়েছেন। তবে তাঁদের একটি অংশের এ বিষয়ে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। তৈরি পোশাক কারখানার মালিকদের একজন বলেছেন, এ রকম কোনো ত্রিপক্ষীয় ফোরাম গঠনের প্রয়োজন নেই। সাক্ষাৎকারদাতা প্রতিনিধিদের দুজন বর্তমান ত্রিপক্ষীয় ফোরামগুলোর (যেমন: সোশ্যাল কমপ্লায়েন্স ফোরাম অথবা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ফোরাম) পুনর্গঠন ও শক্তিবর্ধনের সুপারিশ করেছেন।

এই জরিপে একটি বৈধ ফোরামের স্থায়ী কাঠামোর প্রয়োজনীয়তা খতিয়ে দেখা হয়েছে যাতে অংশীদার এবং প্রতিষ্ঠিত কর্তৃপক্ষের বৃহত্তর অংশগ্রহণ। তাই তৈরি পোশাক খাতের জন্য স্থায়ী ত্রিপক্ষীয় ফোরাম গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে। এটা নতুন করে গঠন হতে পারে অথবা বর্তমান কমিটির রূপান্তর বা পুনর্গঠনের মাধ্যমে অধিকতর শক্তিশালী হতে পারে।

প্রস্তাবিত ত্রিপক্ষীয় কাঠামো ফোরাম, আওতা এবং বৈধতা

প্রস্তাবিত ফোরামটি হবে মূলত একটি আদর্শ ত্রিপক্ষীয় পরিষদ যাতে সরকার, তৈরি পোশাক খাতের শ্রমিক এবং মালিকপক্ষের সমান প্রতিনিধিত্ব থাকবে। জরিপের প্রস্তাব অনুযায়ী এই ফোরামে বিভিন্ন ব্র্যান্ড/ক্রেতা (বায়ার), শিক্ষাবিদ/গবেষক এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের শ্রমিক অধিকার সংগঠনকে রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। এরা পর্যবেক্ষক হিসেবে থাকলেও নীতিনির্ধারণী কাজে অংশ নিতে পারবে না। এই ফোরাম একটা কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ হিসেবে কাজ করবে এবং এটির অধীনে অন্যান্য কমিটি (বর্তমান অথবা নবগঠিত) সাব-কমিটি হিসেবে কাজ করবে। এই ফোরাম একটি তদারক পরিষদ এবং সুপারিশকারী হিসেবে সক্রিয় থাকবে। এটি সাব-কমিটিগুলোর কার্যক্রম এবং সামগ্রিক অগ্রগতি যাচাই করে দেখবে এবং ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবর সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করবে। উদাহরণস্বরূপ; প্রস্তাবিত কমিটি তৈরি পোশাক খাতের জন্য ন্যূনতম মজুরির সুপারিশ ওয়েজ বোর্ড বরাবর বিবেচনার জন্য পেশ করতে পারে। কমিটির আরেকটি কাজ হবে বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ। এটি শিল্প খাতের নিয়মিত বিরোধগুলো খতিয়ে দেখবে এবং যদি কোনো বিরোধ বা সমস্যা দেখা দেয়, কমিটি দ্রুত সাড়া দেবে এবং আলোচনার ভিত্তিতে সরাসরি বা সাব-কমিটিগুলোর মাধ্যমে মীমাংসার চেষ্টা করবে।

প্রতিনিধি বাছাই প্রক্রিয়া

এই জরিপের পরামর্শ হচ্ছে সরকার, শ্রমিক এবং মালিকপক্ষের প্রতিনিধিদের বাছাই করার জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে। ফোরামের সদস্যসংখ্যা হবে ২৭। সরকার, মালিকপক্ষ এবং শ্রমিকদের পক্ষ থেকে নয়জন করে সদস্য থাকবেন। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী এই কমিটির নেতৃত্ব দেবেন। এতে ফোরামের মোট সদস্যসংখ্যা হবে ২৮।

পোশাক শিল্প খাতের নীতি নির্ধারণ ও প্রয়োগ সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান থেকে সরকারের প্রতিনিধিদের বাছাই করা যেতে পারে। দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের পাশাপাশি এ খাতে যুক্ত সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে থাকতে পারে (অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নয়): (ক) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (শ্রমসচিব; আইজি, ডিআইএফই; যুগ্ম সচিব, শ্রম; এবং শ্রম অধিদপ্তরের পরিচালক); (খ) বাণিজ্য মন্ত্রণালয় (বাণিজ্য সচিব এবং রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর মহাপরিচালক); (গ) বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় (সচিব; বস্ত্র অধিদপ্তরের পরিচালক); (ঘ) শিল্প মন্ত্রণালয় (শিল্প সচিব; এবং প্রধান পরিদর্শক, বয়লার); (ঙ) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (মহাপরিচালক, শিল্প পুলিশ; মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস); এবং (চ) জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় (চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইন্সপেক্টর, ইন্সপেক্টরেট অব ইলেকট্রিসিটি, পাওয়ার ডিপার্টমেন্ট); এবং (ছ) গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় (সচিব; প্রধান প্রকৌশলী, পিডব্লিউডি)।

ত্রিপক্ষীয় চেতনা ও উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য শ্রমিকদের প্রতিনিধি হিসেবে ট্রেড ইউনিয়নসমূহ থেকে দায়িত্বশীল ও সচেতন ব্যক্তিদের অবশ্যই ফোরামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে। এভাবে শ্রমিক প্রতিনিধিদের জাতীয় পর্যায় ও বিভিন্ন খাত থেকে বাছাই করতে হবে। মোট প্রতিনিধির সংখ্যা হবে নয়। তিনজন থাকবেন শীর্ষ তিনটি জাতীয় ফেডারেশন (এনটিইউসি) থেকে এবং ছয়জন থাকবেন শীর্ষ ছয়টি আঞ্চলিক শ্রমিক সংগঠন থেকে। এসব সংগঠন শ্রম অধিদপ্তরে অবশ্যই নিবন্ধিত থাকতে হবে।

কারখানা মালিক প্রতিনিধির (নয়জন) বিভিন্ন খাতের সংগঠন থেকে অংশ নিতে পারেন। এ রকম সংগঠনের তালিকায় রয়েছে (ক) বিইএফ, (খ) বিজিএমইএ, (গ) বিকেএমইএ,

(ঘ) বিটিএমইএ; (ঙ) বিসিসিএমইএ; (চ) বিটিটিএমইএ; (ছ) গার্মেন্টস ওয়াশিং ফ্যাক্টরি অ্যাসোসিয়েশন; (জ) গার্মেন্টস প্রিন্টিং ফ্যাক্টরি অ্যাসোসিয়েশন; এবং (ঞ) গার্মেন্টস এমব্রয়ডারি অ্যাসোসিয়েশন।

কমিটি নির্দিষ্ট খাতের অন্যান্য অংশীদারদের মধ্য থেকে কয়েকজন পর্যবেক্ষক অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। এ রকম বড় পরিসরের অংশীদারদের মধ্যে (ক) বিদেশি ক্রেতা বা বায়ার; (খ) শিক্ষাবিদ ও গবেষক, (গ) জাতীয় পর্যায়ের সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান, যেমন: বিল্‌স, ব্লাস্ট, কর্মজীবী নারী, আইন ও সালিস কেন্দ্র এবং নিরাপত্তা ও অধিকার, বুয়েট ইত্যাদি, এবং (ঘ) আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংগঠন যেমন: আইএলও, জিআইজেড, সলিডারিটি সেন্টার এবং অ্যাকশন এইড বাংলাদেশ ইত্যাদি।

প্রাতিষ্ঠানিক কার্যপদ্ধতি

শ্রম ও কর্মসংস্থানমন্ত্রী ফোরামের প্রধান হবেন এবং তৈরি পোশাক খাতে সমন্বয়পূর্ণ সামগ্রিক সমন্বয়ের জন্য দায়বদ্ধ থাকবেন। কার্যক্রম চালানোর জন্য কমিটিকে প্রতি দুই বা তিন মাস অন্তর সভা আয়োজন করতে হবে। এতে সাব-কমিটিগুলোর কার্যক্রম যাচাই ও পর্যালোচনার পাশাপাশি নির্বাচিত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা ও মতবিনিময় থাকবে। ফোরাম সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে অবহিত করবে। প্রস্তাবিত ফোরাম শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করবে।

বিভিন্ন বাধা ও ভবিষ্যতের পথ

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এর আওতায় এ রকম ত্রিপক্ষীয় ফোরাম গঠনের ব্যাপারে কোনো আইনি নির্দেশনা নেই। এটিই তৈরি পোশাক খাতে একটি আদর্শ ত্রিপক্ষীয় ফোরাম প্রতিষ্ঠার পথে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ বা বাধা।

আবার বর্তমান ফোরাম বা কমিটির ভূমিকা কী হবে, তাও আরেকটা চ্যালেঞ্জ। বর্তমান জরিপের প্রস্তাব অনুযায়ী চলতি ফোরাম এই কমিটির অধীনে একটা সাব-কমিটি হিসেবে কাজ করবে। তবু প্রশ্ন হলো চলতি ফোরাম এভাবে কাজ করতে রাজি হবে কি না।

বস্তুত, ত্রিপক্ষীয় কার্যক্রমের মানে তিনটি অংশীদারের (সরকার, শ্রমিকপক্ষ ও মালিকপক্ষ) সক্রিয় যোগাযোগ ও মতবিনিময়। শ্রমিক ও মালিকপক্ষের প্রতিনিধিরা সরকারি প্রতিনিধিদের সঙ্গে একই সমতলে অংশ নিয়ে সব নীতি নির্ধারণ এবং তার প্রক্রিয়ায় যোগ দেবেন। সেরা প্রতিনিধিদের বাছাই করাটাই চ্যালেঞ্জ, যাঁরা শ্রমিক ও মালিকপক্ষের সত্যিকারের প্রতিনিধিত্ব করবেন এবং পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে সব সমস্যার অভিন্ন সমাধানের জন্য দায়বদ্ধ হবেন।

চ্যালেঞ্জগুলো জয় করার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অনুসরণ করা গুরুত্বপূর্ণ:

প্রথমত, তৈরি পোশাক খাতে একটি আদর্শ ত্রিপক্ষীয় ফোরাম প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রম আইনের সংশোধন প্রয়োজন। এটা গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে তিন পক্ষের অংশীদারির অবশ্যই আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রয়োজন এবং সেটাকে টেকসই করতে হবে। তিন পক্ষকে এ বিষয়ে উন্মুক্ত সমঝোতায় পৌঁছাতে হবে এবং পারস্পরিক অঙ্গীকার নির্ধারণ করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, তৈরি পোশাক খাতে ভিন্ন একটা স্থায়ী ফোরাম প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব সম্পর্কে অংশীদারদের মধ্যে সামাজিক সংলাপের ভিত্তিতে সমসম্মত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তৈরি পোশাক খাতে ত্রিপক্ষীয় ফোরামের অবস্থানসহ অন্যান্য বিষয়ে চলতি ফোরামগুলোর মধ্যে অবশ্যই মতৈক্য হতে হবে। অংশীদারি কেবল প্রতীকী বা কেবল আলোচনামূলক নয়, বরং ব্যাপকভাবে সক্রিয় হতে হবে। নইলে ত্রিপক্ষীয় প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম শ্রম খাতের প্রশাসনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

সর্বশেষ এবং সর্বোপরি, ত্রিপক্ষীয় ব্যবস্থায় সব সক্রিয় অংশীদারের সামর্থ্য অবশ্যই তাদের অঙ্গীকার, প্রতিযোগিতা এবং পারস্পরিক সম্মতিমূলক সমাধানের লক্ষ্যে কাজে লাগাতে হবে।

তথ্যপঞ্জি

বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিজিএমইএ) ২০১৫

ভূঁইয়া, মোহাম্মদ ইসমাইল। (২০১৩) রিজনেবল ওয়েজেস ফর ওয়ার্কার্স টু এলিমিনেট আনরেস্ট ইন বাংলাদেশস রেডিমেড গার্মেন্টস (আরএমজি) সেক্টর

বাংলাদেশ এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোনস অথরিটি (বিইপিজেডএ) অ্যানুয়াল রিপোর্ট ২০১১-১২

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ (বিএলএ ২০০৬), ঢাকা, বাংলাদেশ সরকার, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, বাংলাদেশ ওয়েবসাইট

ফারুক আল আবদুল্লাহ। (২০০৯) কারেন্ট স্ট্যাটাস অ্যান্ড ইভল্যুশন অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস সিস্টেম ইন বাংলাদেশ। কর্নেল ইউনিভার্সিটি আইএলআর স্কুল।

বাংলাদেশ সরকার। (২০১০)। ইপিজেড ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস অ্যাক্ট (ইডব্লিউএআইআরএ) ২০১০, ঢাকা

বাংলাদেশ সরকার (২০১৪)। দ্য সাকসেস অব ফাইভ ইয়ার্স: ২০০৯-২০১৩, মিনিস্ট্রি অব লেবার অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট, ঢাকা, বাংলাদেশ

হোসেন জাকির, আহমেদ মুস্তাফিজ এবং আকন্দ আওরঙ্গজেব (২০১৪)। টেক্সটাইল অ্যান্ড গার্মেন্টস সেক্টর ইন বাংলাদেশ: সেক্টরাল প্রোফাইল অ্যান্ড দ্য স্টেট অব ওয়ার্কার্স রাইটস অ্যান্ড ট্রেড ইউনিয়নস, ঢাকা: বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ

হোসেন জাকির। (২০১২) মুভিং আপ অর অন? রোল অব লেবার জুডিশিয়ারি টু এনশিওর ওয়ার্কার্স রাইটস ইন বাংলাদেশ, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ

হোসেন, জাকির, আহমেদ, মুস্তাফিজ এবং আক্তার, আফরোজা। (২০১০)। ডিসেন্ট ওয়ার্ক অ্যান্ড বাংলাদেশ লেবার ল: প্রভিশনস, স্ট্যাটাস অ্যান্ড ফিউচার ডিরেকশনস। ঢাকা, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ।

আইএলও। (২০১৩)। ন্যাশনাল ট্রাইপারটাইট সোশ্যাল ডায়ালগ: এন আইএলও গাইড ফর ইমপ্রুভড গভর্ন্যান্স।

দি ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস। ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৪।

পরিশিষ্ট-১:

তৈরি পোশাক খাতের পরিচিতি: শিল্প, শ্রম ও ব্যবসা

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে যেসব খাতের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে, তৈরি পোশাক খাত সেগুলোর একটি। বিজিএমইএর হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে এখন (২০১৪-১৫ সাল) চার হাজার ২৯৬টি পোশাক কারখানা আছে। ২০১২-১৩ সালে এই সংখ্যা ছিল পাঁচ হাজার ৬০০। আর ডিআইএফইর তথ্য অনুযায়ী দেশে বর্তমানে তিন হাজার ৮০৮টি কারখানা চালু রয়েছে। তবে এ সংখ্যা রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চলে (ইপিজেড) বিদ্যমান কারখানাগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করেনি। বেপজার হিসাব (২০১১-১২ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন) অনুযায়ী ইপিজেডের মধ্যে ১০১টি পোশাক কারখানা আছে। কারখানা মালিক সমিতির সদস্য হিসাব করলে দেখা যায় বিজিএমইএ এবং বিকেএমইএর আওতায় যথাক্রমে তিন হাজার ৫০৭টি এবং এক হাজার ৯৫৩টি পোশাক কারখানা রয়েছে। এসব কারখানা প্রধানত দেশের দুটি বিভাগে অবস্থিত- ঢাকা (৮৬.৪%) এবং চট্টগ্রাম (১৩.৫%)। তৈরি পোশাক শিল্প বিভিন্ন ধরনের পণ্য উৎপাদন কওে এমন বিভিন্ন কারখানার সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে, যেমন: নিট, উওভেন এবং সোয়েটার (যদিও সোয়েটার আসলে নিট পণ্যসামগ্রীর অংশ)। এসব কারখানার মধ্যে নিট এবং উওভেন কারখানাগুলোর অনুপাত সমান্তরাল- যথাক্রমে ৩৯ দশমিক দুই শতাংশ এবং ৩৯ দশমিক এক শতাংশ। সোয়েটার কারখানার অনুপাত ১৬ দশমিক ৪৯ শতাংশ এবং তিন দশমিক ১৪ শতাংশ কারখানায় নিট এবং উওভেন -দুই ধরনের পণ্যই উৎপাদিত হয়। চট্টগ্রাম বিভাগে উওভেন কারখানাগুলোর সংখ্যা তুলনামূলক বেশি (চট্টগ্রামে সর্বমোট কারখানার অর্ধেকের বেশি)। আর ঢাকা বিভাগে নিট কারখানাগুলোর সংখ্যা তুলনামূলক বেশি।

দেশের তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমশক্তির একটা বড় অংশের কর্মসংস্থান করেছে। তবে এ শ্রমশক্তির সঠিক হিসাব পাওয়া কঠিন। বিজিএমইএর হিসাবে তৈরি পোশাক শিল্পে বর্তমানে ৪০ লাখ শ্রমিক কর্মরত আছে। তবে সরকারের অনুমান এসব শ্রমিকের

সংখ্যা দুই লাখ ২০ হাজারের মতো (শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ২০১৫)। পোশাক শ্রমিকদের বেশির ভাগই নারী। বিজিএমইএ এ বিষয়ে কোনো তথ্য উপাত্ত দিতে পারে না। কারণ, তারা লৈঙ্গিক বিভাজনের ভিত্তিতে শ্রমিকদের তথ্য সংরক্ষণ করেনি। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় জানায়, তৈরি পোশাকের কারখানাগুলোতে নয় লাখ ২৯ হাজার ৫৭০ জন পুরুষ কর্মী এবং ১২ লাখ ৪৫ হাজার ৯৫৭ জন নারী কর্মী যুক্ত রয়েছেন। অর্থাৎ পুরুষ ও নারী কর্মীদের অনুপাত যথাক্রমে ৪৩ ও ৫৭ শতাংশ। এই হিসাব মানুষের সাধারণ হিসাবের সঙ্গে অত্যন্ত সাংঘর্ষিক। কারণ, সাধারণ অনুমান বলছে তৈরি পোশাক খাতের ৮০ শতাংশের বেশি শ্রমিক নারী।

তৈরি পোশাক খাত বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের বৃহত্তম উৎস। দেশের রপ্তানি আয়ের ৮০ শতাংশের বেশি এই খাত থেকে আসে, যার পরিমাণ ছিল ২০১৪-১৫ সালে দুই হাজার ৫৪৯ কোটি ১০ লাখ টাকা। এটা বিজিএমইএর ২০১৫ সালের হিসাব। ৩৭টি দেশে বাংলাদেশ মূলত শার্ট, টি-শার্ট,ট্রাউজার্স, জ্যাকেট এবং সোয়েটার রপ্তানি করে থাকে। প্রাথমিক পর্যায়ে (১৯৯০-এর দশক) যুক্তরাষ্ট্রই ছিল বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানির প্রধান গন্তব্য। তখন ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত (ইইউ) দেশগুলো দ্বিতীয় স্থানে ছিল। কিন্তু বর্তমানে ইইউর দেশগুলোতেই বাংলাদেশ থেকে তৈরি পোশাক আমদানির ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড়িয়ে গেছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ তৈরি পোশাক খাতের ৬১ শতাংশ পণ্য ইউরোপে এবং ২১ শতাংশ যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করেছে। বিজিএমইএর ওয়েবসাইটে এ তথ্য আছে। দেশের আনুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের ৫৯ শতাংশ তৈরি পোশাক খাতের আওতায় রয়েছে, যা বৃহত্তম (আহমেদ ও আকন্দ, ২০১০৩)। মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) হিসাবেও তৈরি পোশাক খাতের অবদান উল্লেখযোগ্য। এই খাত জিডিপির ১৭ শতাংশ অর্জনে অবদান রাখছে।

বাংলাদেশে তৈরি পোশাক খাতের বিকাশের মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবকগুলো হচ্ছে সস্তা শ্রম, প্রতিদ্বন্দ্বী অন্যান্য দেশের তুলনায় নিরাপদ বিনিয়োগ, অনুকূল কর্মপরিবেশ, সরকারি সহায়তা এবং একটা গতিময় বেসরকারি উদ্যোগ। এসব প্রভাবক বাংলাদেশকে বিশ্ব পোশাকের বাজারে দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানিকারক দেশের অবস্থান অর্জনে সাহায্য করেছে।

অ্যানেক্স-২: গুরুত্বপূর্ণ তথ্যদাতাদের তালিকা

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার

খন্দকার মোস্তান হোসেন	যুগ্ম সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মো. শহীদুল্লাহ আজিম	ভাইস প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিজিএমইএ)
ড. ওয়াজেদুল ইসলাম খান	সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন সেন্টার (বিটিইউসি)
রায় রমেশ চন্দ্র	সাধারণ সম্পাদক, ইন্ডাস্ট্রিঅল বাংলাদেশ সদস্য, সংকট ব্যবস্থাপনা কমিটি
মাসুদা খাতুন শেফালী	নির্বাহী পরিচালক, নারী উদ্যোগ কেন্দ্র (এনইউকে)
তৌহিদুর রহমান	প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি ওয়ার্কার্স ফেডারেশন
এ.কে.এম নাসিম	জ্যেষ্ঠ আইনি পরামর্শক, সলিডারিটি সেন্টার, বাংলাদেশ
রব ওয়েইস	নির্বাহী পরিচালক, অ্যাকর্ড অন ফায়ার অ্যান্ড বিল্ডিং সেফটি ইন বাংলাদেশ (অ্যাকর্ড)
হেনরিক ম্যায়হ্যাক	সাবেক কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভ, ফ্রেডরিক-ইবার্ট-স্টিফটুং (এফইএস)
সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ	নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স

আলোচনাসভা

বিল্‌স লিডারশিপ (২৩ নভেম্বর ২০১৫)

শাহ মোহাম্মদ আবু জাফর	সদস্য, বিল্‌স উপদেষ্টা পরিষদ
রায় রমেশ চন্দ	সদস্য, বিল্‌স উপদেষ্টা পরিষদ
মোহাম্মদ জাফরুল হাসান	যুগ্ম-মহাসচিব, বিল্‌স নির্বাহী পরিষদ

ইন্ডাস্ট্রিঅলের প্রতিনিধিবৃন্দ (১৩ নভেম্বর ২০১৫)

হুমায়ুন কবির	বাংলাদেশ কেমিক্যাল ওয়ার্কার্স ফেডারেশন
শামীমা নাসরিন	স্বাধীন বাংলা গার্মেন্টস শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন
হেদায়েতুল ইসলাম	বাংলাদেশ জাতীয় শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন
হাবিবুর রহমান	বাংলাদেশ গার্মেন্টস, টেক্সটাইল অ্যান্ড লেদার ওয়ার্কার্স ফেডারেশন
তাহমিনা রহমান	বাংলাদেশ অ্যাপারেলস ওয়ার্কার্স ফেডারেশন
সাফিয়া পারভিন	ন্যাশনাল গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ফেডারেশন
মো. শহীদুল্লাহ বাদল	বাংলাদেশ মেটাল ওয়ার্কার্স লীগ
সালাহউদ্দিন স্বপন	বাংলাদেশ বিপ্লবী গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ফেডারেশন
আলেয়া আক্তার	বাংলাদেশ গার্মেন্টস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কার্স ফেডারেশন
আলি আজগর	গার্মেন্টস টেইলর ওয়ার্কার্স লীগ
বাবুল আক্তার	ইন্ডাস্ট্রিঅল বাংলাদেশ কাউন্সিল
রায় রমেশ চন্দ্র	ইউনাইটেড ফেডারেশন অব গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স
ইয়াসিন আহমেদ	বাংলাদেশ ফেডারেশন অব ওয়ার্কার্স সলিডারিটি

সেমিনারে যাঁরা অংশ নিয়েছেন (২৯ নভেম্বর ২০১৫)

খন্দকার মোস্তান হোসেন	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মো. শহীদুল্লাহ আজিম	বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিজিএমইএ)
আলহাজ্ব শুকুর মাহমুদ	জাতীয় শ্রমিক লীগ (জেএসএল)

ড. ওয়াজেদুল ইসলাম খান	বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন সেন্টার (বিটিইউসি)
রায় রমেশ চন্দ্র	ইউনাইটেড ফেডারেশন অব গার্মেন্ট ওয়ার্কার্স (ইউএফজিডব্লিউ)
অ্যাড. দেলোয়ার হোসেন খান	বাংলাদেশ লেবার ফেডারেশন (বিএলএফ)
আনোয়ার হোসেন	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল (বিজেএসডি)
রাজেকুজ্জামান রতন	সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট (এসএলএফ)
এ.এস.এম. জাকারিয়া	জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশন (জেএসএফ)
হেনরিক ম্যায়হ্যাক	ফ্রেডরিক-ইবার্ট-স্টিফটুং (এফইএস)
অ্যালোনজো সুসন	সলিডারিটি সেন্টার
রোকেয়া রফিক	কর্মজীবী নারী
মাহতাব উদ্দিন আহমেদ	সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)
কুতুবউদ্দিন আহমেদ	বাংলাদেশ গার্মেন্টস, টেক্সটাইল অ্যান্ড লেদার ওয়ার্কার্স ফেডারেশন (বিজিটিএলডব্লিউএফ)
শামীম আরা	বাংলাদেশ জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশন (বিজেএসএফ)
নাজমা আক্তার	সম্মিলিত গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন (বিজেএসএফ)
সিরাজুল ইসলাম রনি	বাংলাদেশ জাতীয় গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স এমপ্লয়িজ লীগ (বিএনজিডব্লিউইএল)
এ.কে.এম নাসিম	সলিডারিটি সেন্টার
ফারহানা নাসরিন	সলিডারিটি সেন্টার
প্রভাত টুডু	বাংলাদেশ লিগ্যাল অ্যাইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)
ড. এটিএম সাইফুল রশিদ	সিডিপিও
রাফায়েত উল্লাহ মৃধ	দি ডেইলি স্টার
ফয়সাল মোর্শেদ	বিজিআইডব্লিউএফ
নাজমা আক্তার	জেএসএফডিবি
আদিত্য আরাফাত	বাংলা নিউজ টুয়েন্টিফোর ডটকম
মইনুল হক	নিউ এইজ
আবু হেনা মুজিব	সমকাল
এম. সায়েম টিপু	কালের কণ্ঠ
মো. বদরুল আলম	বণিক বার্তা
হাসান আহমেদ	পরিবর্তন ডটকম
ড. জাকির হোসেন	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ (বিল্‌স)
নাজমা ইয়াসমিন	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ (বিল্‌স)
আফরোজা আক্তার	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ (বিল্‌স)

অ্যানেক্স ৩: কেআইআই নির্দেশনা

বাংলাদেশে তৈরি পোশাক খাতে ত্রিপক্ষীয় সম্পর্কের অবস্থা এবং সমন্বয়পূর্ণ শিল্প ও শ্রমিক সম্পর্কের সম্ভাবনা

১. ত্রিপক্ষীয় সম্পর্কের প্রয়োজনীয়তা

- আপনি কি পোশাক কারখানাগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, বিরোধ মীমাংসা এবং ন্যায়সংগত কাজের নিশ্চয়তা দিতে ত্রিপক্ষীয় আলোচনা পদ্ধতির প্রয়োজন মনে করেন? কেন এমন মনে করেন?

২. তৈরি পোশাক খাতে ত্রিপক্ষীয় সম্পর্কের বর্তমান অবস্থা

২.১ দ্বিপক্ষীয় ও ত্রিপক্ষীয় ফোরামের বর্তমান কাঠামো

- আমরা জানি আপনি ত্রিপক্ষীয়/দ্বিপক্ষীয় ফোরামের একজন সদস্য। আপনি কয়টি কমিটির প্রতিনিধিত্ব করেন?
- আপনি যুক্ত আছেন এমন ত্রিপক্ষীয়/দ্বিপক্ষীয় ফোরাম বা কমিটির কাঠামো সম্পর্কে আপনি কি আমাদের কিছু ধারণা দেবেন? (কাজের মেয়াদ, বর্তমান কর্তৃপক্ষ, আওতাধীন খাত ইত্যাদি)

২.২ ফোরামের কাজ

- ফোরাম কমিটি কীভাবে কাজ করে? (সভা, সদস্যদের উপস্থিতি, বিরোধ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া, রিপোর্টিং ইত্যাদি)
- আপনার কমিটি কি বর্তমানে সক্রিয় রয়েছে? যদি না হয়, কেন?
- আপনি কি জানেন বর্তমানে কতগুলো দ্বিপক্ষীয় বা ত্রিপক্ষীয় ফোরাম বা কমিটি তৈরি পোশাক খাতে কাজ করছে? অনুগ্রহ করে সেগুলোর নাম উল্লেখ করুন।

২.৩ অর্জন ও বাধাসমূহ

- কাজ করতে গিয়ে আপনার ফোরাম কি কোনো বাধার সম্মুখীন হয়েছে?
- যেহেতু সরকার সরাসরি ত্রিপক্ষীয় ফোরাম বা কমিটিতে অংশ নিচ্ছে, আপনি কি মনে করেন এটা কোনোভাবে মালিকপক্ষের অনুকূলে কাজ করতে পারে?
- আপনার মতে আপনার ফোরাম/কমিটির অর্জনসমূহ কী কী?

২.৪ বিভিন্ন ফোরামের সমন্বয় পদ্ধতি এবং সহযোগিতামূলক আয়োজন

- বিভিন্ন ফোরামের মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতার কোনো পদ্ধতি বা ব্যবস্থা আছে কি? অথবা প্রতিটি ফোরাম বা কমিটি কি স্বতন্ত্রভাবে কাজ করে? যদি তা হয়, কাজের পদ্ধতিটা কী? যদি না হয়, আপনি কি মনে করেন তৈরি পোশাক খাতে কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা, বিরোধ নিষ্পত্তি এবং ন্যায় নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন ফোরামের মধ্যে একটা সমন্বয় ও সহযোগিতার দরকার?

২.৫ সুসংবদ্ধ শিল্প ও শ্রমিক সম্পর্কের জন্য প্রয়োজনীয় কাঠামোগত পরিবর্তন

- আপনি কি মনে করেন সুসংবদ্ধ শিল্প ও শ্রমিক সম্পর্কের জন্য প্রয়োজনীয় কাঠামোগত কোনো পরিবর্তন প্রয়োজন? যদি তাই হয়, কী ধরনের পরিবর্তনের পরামর্শ আপনি দেবেন? যদি পরিবর্তনের প্রয়োজন না থাকে, তার কারণ কী?

৩. ত্রিপক্ষীয় ফোরামের একটি জাতীয় কাঠামোর লক্ষ্যে

৩.১ যৌক্তিকতা

- আপনি কি মনে করেন তৈরি পোশাক খাতে একটি সুসংবদ্ধ শিল্প ও শ্রমিক সম্পর্কের জন্য একটি জাতীয় ত্রিপক্ষীয় ফোরাম প্রয়োজন? কেন আপনি এমন মনে করেন?
- আপনি কি মনে করেন তৈরি পোশাক খাতে একটি জাতীয় ত্রিপক্ষীয় ফোরাম গঠিত হলে বর্তমান কমিটি বা ফোরামগুলো গুরুত্ব হারাবে?

৩.২ জাতীয় ত্রিপক্ষীয় ফোরাম গঠনের পথে প্রতিবন্ধকতাসমূহ

- আপনার মতে তৈরি পোশাক খাতে জাতীয় ত্রিপক্ষীয় ফোরাম গঠনের পথে সম্ভাব্য বাধাগুলো কী কী? এসব মোকাবিলার জন্য কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে?

৩.৩ ফোরাম, আওতা ও বৈধতা

- একটি জাতীয় ত্রিপক্ষীয় ফোরামের কাঠামো বা গঠন কেমন হওয়া উচিত? কীভাবে এটি গঠিত হবে (গঠন প্রক্রিয়া)? কমিটির সদস্যরা কীভাবে নির্বাচিত হবেন?
- একটি জাতীয় ত্রিপক্ষীয় ফোরামের কাজের আওতা কী হওয়া উচিত?
- ফোরামের মূল কর্তৃত্ব কার হাতে থাকবে?
- জাতীয় ত্রিপক্ষীয় ফোরামকে কী ধরনের ক্ষমতা দেওয়া হবে?

৩.৪ প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠামো

- জাতীয় ত্রিপক্ষীয় ফোরামের মূল দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো কী হবে?
- জাতীয় ফোরামটি কীভাবে কাজ করবে (কাজের প্রক্রিয়া)?

অ্যানেক্স ৪:

তৈরি পোশাক খাতে ত্রিপক্ষীয় পরামর্শমূলক কমিটি গঠন: সুযোগ ও চ্যালেঞ্জ, অংশীদারদের ভূমিকা শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক
তারিখ ও স্থান: অক্টোবর ৪, ২০১৬, দ্য ডেইলি স্টার সেন্টার

গোলটেবিলের উদ্দেশ্যসমূহ: গোলটেবিলের মূল উদ্দেশ্য ছিল পোশাকশিল্পের জন্য একটি স্থায়ী ত্রিপক্ষীয় পরামর্শমূলক কমিটি গঠনের লক্ষ্যে বিভিন্ন অংশীদারের সুপারিশগুলো গ্রহণ করা।

ডেইলি স্টার সেন্টারে অনুষ্ঠিত গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ লেবার স্টাডিজ-বিল্স ২০১৬ সালের ৪ অক্টোবর ফ্রেডরিক ইবার্ট স্টিফটুং (এফইএস) এর সহায়তায় ডেইলি স্টার ভবনের আজিমুর রহমান মিলনায়তনে 'তৈরি পোশাক খাতে ত্রিপক্ষীয় পরামর্শমূলক কাউন্সিল গঠন: সুযোগ ও চ্যালেঞ্জ, অংশীদারদের ভূমিকা' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে। বৈঠকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জাকির হোসেন গবেষণা প্রতিবেদনটি উত্থাপন করেন।

একওয়ার্ড উইলহেম হেইন এর সাথে ফ্রান্সিসকা কর্ন, শ্রীনিবাস রেড্ডি ও শুক্কুর মাহমুদ

গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা বলেন, শ্রম আইনকে কার্যকরভাবে প্রয়োগ করতে হলে পোশাকশিল্পের মালিক ও শ্রমিকদেরকে আইনটিকে ভালোভাবে বুঝতে হবে যা মালিক,শ্রমিক ও সরকারকে ত্রিপক্ষীয় পরামর্শমূলক কমিটি গঠনকে সহজতর করবে। তারা আরও বলেন, মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে প্রধান সমস্যাগুলো হচ্ছে বেতন, কর্মঘণ্টা, কর্মস্থলের নিরাপত্তা ও সামাজিক নিরাপত্তা।

একটি ত্রিপক্ষীয় পরামর্শমূলক কমিটি যদি গঠন করা সম্ভব হয় তখন এসব সমস্যা কার্যকরভাবে সমাধান করা সম্ভব হবে। বর্তমান অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করে বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের নেতারা এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, শুধু পরামর্শমূলক কমিটি গঠন করে এসব সমস্যার সমাধান হবে না। কারণ এই সব কমিটি পরামর্শ দেয় এবং নৈকট্য সৃষ্টি করে। বিতর্ককে ন্যায়সংগত করার জন্য তারা সরকারকে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু এই কমিটিগুলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষমতা দেওয়া হয় না।

ফারুক হাসানের সাথে রায় রমেশ চন্দ্র ও খন্দকার মোস্তান

বক্তারা আরও উল্লেখ করেন, শক্তিশালী শ্রমিক ইউনিয়ন ও নিবেদিতপ্রাণ নেতা ছাড়া এই কমিটি দ্বারা শ্রমিকেরা উপকৃত হবে না। তারা বলেন, ক্রেতা ও বিনিয়োগকারীদের চাপের পরও লাভ করার মানসিকতা থেকে মালিকেরা তাদের ইচ্ছেমতো শ্রমিকদের পরিচালনা করেন।

গোলটেবিল বৈঠকে শুক্কুর মাহমুদ, মিকাইল শিপার ও মোঃ জাফরুল হাসান

জাতীয় শ্রমিক লীগের সভাপতি ও বিল্‌স এর ভাইস চেয়ারম্যান আলহাজ শুক্কুর মাহমুদ বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মিকাইল শিপার। বিল্‌স এর নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ সঞ্চালক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিকেএমইএ) সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট মো. হাতেম, বাংলাদেশ তৈরি পোশাক প্রস্তুত ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ফারুক হাসান, ঢাকায় জার্মান দূতাবাসের উন্নয়ন সহযোগিতা শাখার প্রধান এখার্ড উইলহেম হেইনে, আইএলও'র কান্ট্রি ডিরেক্টর শ্রীনিবাস বি রেড্ডি, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মো. আমিনুল ইসলাম ও খন্দকার মোস্তান হোসেন

এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উপপ্রধান (বস্ত্র) মো. রুহুল আমিন, বিল্‌স এর উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য রায় রমেশ চন্দ্র, যুগ্ম মহাসচিব মো. জাফরুল হাসান, শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদের যুগ্ম সমন্বয়ক ও জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার হোসেন,এফইএস এর আবাসিক প্রতিনিধি ফ্রানজিস্কা কর্ন, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) সিনিয়র টেকনিক্যাল অফিসার ওয়ায়েল ইসসা, থ্রিএফ এর কান্ট্রি ডিরেক্টর স্টেন পিটারসেন , সলিডারিটি সেন্টার'র কান্ট্রি'র প্রোগ্রাম ডিরেক্টর আলেনজো সুসন, ট্রেড ইউনিয়ন সংঘের সাধারণ সম্পাদক চৌধুরী আশিকুল আলম, ইন্ডাস্ট্রি অল বাংলাদেশ এর প্রেসিডেন্ট আমিরুল হক আমিন, কর্মজীবী নারী'র নির্বাহী পরিচালক রোকেয়া রফিক, আইএলও'র ঢাকা কার্যালয়ের প্রোগ্রাম অফিসার

একওয়ার্ড উইলহেম হেইন ও ফ্রান্সিসকা কর্ন

মো. সাইদুল ইসলাম প্রমুখ। বিল্‌স ও স্কপভুক্ত জাতীয় শ্রমিক সংগঠনগুলো ছাড়াও নিয়োগকারীদের কমিটিগুলোর প্রতিনিধিরা, বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাবিদ এবং তৈরি পোশাকশিল্পের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

অন্যান্যদের সাথে এলোনঝো সুসন

বৈঠকে বিল্‌স এর উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য রায় রমেশ চন্দ্র বলেন, পোশাকশিল্পের উদ্যোক্তা, শ্রমিক সংগঠনের নেতা , সরকারি কর্মকর্তা ও উন্নয়ন অংশীদাররা দেশটির পোশাক খাতের সমস্যা দূর করার জন্য স্থায়ী ত্রিপক্ষীয় পরামর্শমূলক কমিটি গঠনের পক্ষে আছেন। পোশাক খাতে আমাদের একটি স্থায়ী ত্রিপক্ষীয় পরামর্শমূলক কমিটি দরকার মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে সুন্দর সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য। তিনি আরও বলেন, এই পরামর্শমূলক কমিটি হবে একটি কর্তৃপক্ষ এবং নীতনির্ধারকদের এবং অন্যান্য অংশীদারদের এই কমিটির সুপারিশ মেনে নিতে হবে। তা না হলে এটা হবে একটি কাগজভিত্তিক কমিটি। এই কমিটিকে কার্যকর করার জন্য পোশাক খাতে লাইন মন্ত্রণালয় থাকা উচিত।

বিকেএমইএ'র সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহম্মদ হাতেম বলেন, এ ধরনের একটি কমিটির গঠন দেখতে পেলে আমরা খুব খুশি হব। ইন্ডাস্ট্রি অল বাংলাদেশ এর প্রেসিডেন্ট আমরুল হক আমিন বলেন, পরামর্শক কমিটিকে অবশ্যই কার্যকর করতে হবে যাতে তা ব্যর্থ না হয়।

গোলটেবিল বৈঠকের একাংশ

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) এর কান্ট্রি ডিরেক্টর শ্রীনবাস রেড্ডি পরামর্শমূলক কমিটি গঠনের উদ্যোগকে মহৎ বলে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, ত্রিপক্ষীয় কৌশল সমাজের এবং আইএলও'র মূল মূল্যবোধগুলোর মধ্যে একটি।

রেড্ডি বলেন, কোনো সমস্যা উদ্ভূত হওয়ার পর আলোচনায় বসার চেয়ে নিয়মিত আলোচনা হওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ। ২০২১ সালের মধ্যে ৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের পোশাক রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতের হলে পোশাক খাতের উচিত শ্রমিকদের তাদের অংশীদার করে নেওয়া।

গোলটেবিল বৈঠকে শ্রীনিবাস রেড্ডি

শ্রম সচিব মিকাইল শিপার বলেন, সামাজিক সংলাপ ছাড়া বিতর্কের সমাধান হবে না এবং কোনো আস্থাও অর্জিত হবে না। তিনি বলেন, আমি মনে করি যে একটি স্থায়ী পরামর্শক কমিটি থাকতে হবে। তিনি মন্ত্রণালয়ের বিবেচনার জন্য পরামর্শক কমিটির একটি কাঠামো জমা দেওয়ার পরামর্শ দেন । শিপার বলেন, আমরা রাতারাতি আইনগুলো বদলাতে পারব না কিন্তু আমাদের নীতিমালা আছে যেখানে আমরা পরিবর্তন আনতে পারি।

রেড্ডি ও শিপার দুজনেই বলেন, পোশাক খাতের জন্য প্রস্তাবিত পরামর্শক কমিটিকে অবশ্যই বিদ্যমান জাতীয় ত্রিপক্ষীয় পরামর্শক কমিটির সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। শিপার বলেন, তা না হলে এটা হবে একটা প্রহসন।

বিজিএমইএ'র সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ফারুক হাসান বলেন,গত কয়েক বছরে পোশাক কারখানার মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি হয়েছে, যদিও তা প্রত্যাশিত মাত্রায় হয়নি। তিনি বলেন, বাংলাদেশ পোশাক রপ্তানির দিক দিয়ে বিশ্বে দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশে পরিণত হয়েছে সরকার ও ক্রেতাদের অব্যাহত সমর্থনের ফলে।

গোলটেবিল বৈঠকে মিকাইল শিপার

শ্রমিক নেতা বাবুল আক্তার বলেন, প্রস্তাবিত পরামর্শক কমিটির নেতাদের অবশ্যই পোশাক খাত থেকে নির্বাচন করতে হবে। আরেক শ্রমিক নেতা, শামীমা নাসরিন বলেন, এই কমিটিতে যথেষ্ট সংখ্যক নারী প্রতিনিধি রাখতে হবে কারণ পোশাকশ্রমিকদের বেশির ভাগই নারী।

গোলটেবিল বৈঠকে অন্যান্যদের সাথে সেন্ট টফ্‌ট পিটারসেন

ঢাকায় জার্মান দূতাবাসের উন্নয়ন সহযোগিতা বিভাগের প্রধান এখার্ড উইলহেম হেইনে বলেন, ত্রিপক্ষীয় এই কমিটি বড় কোনো কিছুর জন্ম দিতে পারে। কাজেই একটি ত্রিপক্ষীয় কমিটি গঠন যাতে আমরা করতে পারি সে জন্য আমাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

ডেনমার্কের সবচেয়ে বড় ট্রেড ইউনিয়ন থ্রিএফ এর কান্ট্রি ডিরেক্টর স্টেন পিটারসেন বলেন, একটি সুস্পষ্ট আইনি ম্যান্ডেট ছাড়া একটি ত্রিপক্ষীয় কমিটি কার্যকরভাবে কাজ করতে পারবে না। তিনি বলেন, বাংলাদেশে শ্রম আদালতের ৯০ শতাংশ মামলা কারখানা পর্যায়ে সমাধান সম্ভব।

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, পোশাক শিল্পর মালিক ও শ্রমিক উভয়ের স্বার্থ সংরক্ষণে আগেও বেশ কয়েকটি ফোরাম ও কমিটি গঠিত হয়েছে। কিন্তু সেগুলো সক্রিয়ভাবে কাজ করার বদলে প্রতিক্রিয়াশীলভাবে কাজ করে। এর ফলে আমরা কাঙ্খিত ফলাফল পাইনি। আমরা আশা করি শ্রম মন্ত্রণালয় ত্রিপক্ষীয় কমিটি গঠনের সময় এই বিষয়টি মাথায় রাখবেন।

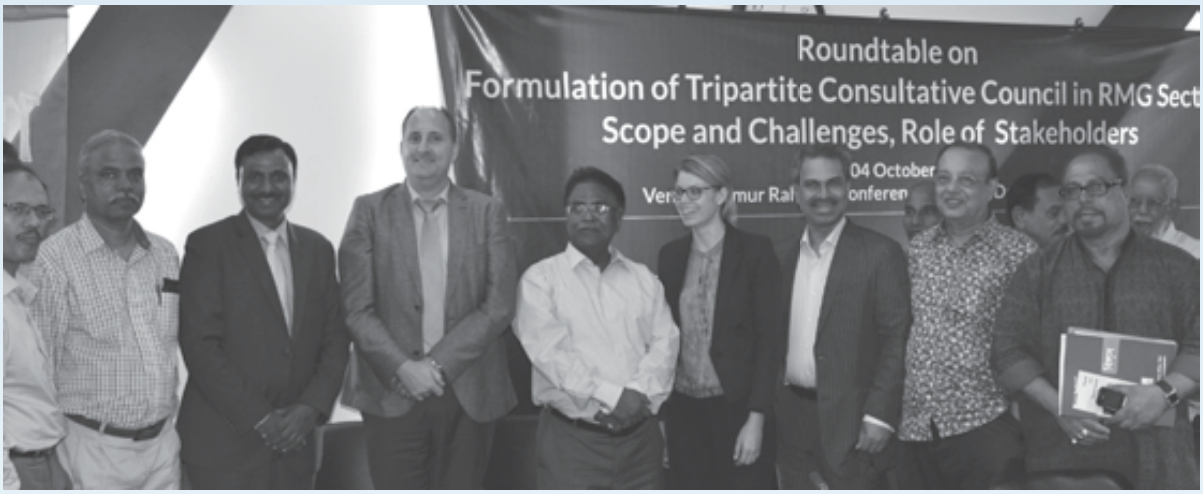

একটি ফটোসেশনে একসাথে অংশগ্রহণকারীরা

শ্রমিক নেতারা প্রস্তাবিত কমিটিতে বিশ্বব্যাপী সুনাম রয়েছে এমন ব্র্যান্ডের প্রতিনিধিদেরও রাখার সুপারিশ করেছেন। কেননা তারাও সাপ্লাই চেইনের অংশ।

সুপারিশসমূহ:

১. সকল পক্ষ এই ধরনের একটি কমিটি গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবে এবং বিরোধ নিষ্পত্তি করার জন্য সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে ও নিয়মিত সংলাপে বসবে।

২. ত্রিপক্ষীয় কমিটি আইন দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত যাতে সব পক্ষ এর প্রস্তাবনাগুলি অনুসরণ করতে বাধ্য থাকে

৩. প্রতিনিধি নির্বাচন পদ্ধতি স্পষ্ট এবং স্বতঃস্ফূর্ত হতে হবে যাতে এটি নিয়োগকর্তা এবং কর্মীদের থেকে সমস্ত প্রধান দলগুলির প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করে। এই ক্ষেত্রে, জাতীয় ফেডারেশন এবং তৈরি পোশাকশিল্প ভিত্তিক প্রতিনিধিদের প্রতিনিধিত্ব শ্রমিকদের পক্ষে নিশ্চিত করা উচিত। একইভাবে, নিয়োগকর্তাদের প্রতিনিধিত্বের বিষয়টিও নিশ্চিত করতে হবে।

৪. ত্রিপক্ষীয় কমিটি এবং অন্যান্য কমিটিগুলোর মধ্যে সমন্বয় থাকা উচিত যাতে কার্যক্রমগুলি তাদের নীতির সঙ্গে ভারসাম্যপূর্ণ হয়।

৫. একটি আইনি বিধান থাকা উচিত যাতে কোনো বিতর্ক পর্যবেক্ষণ বা কোনো অভিযোগ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কমিটি অন্য পক্ষকে ডাকতে পারে।

৬. প্রয়োজন হলে , কমিটি বিদেশি ক্রেতা এবং জাতীয় মানবাধিকার সংস্থার মতো অন্যান্য প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ করতে পারে যারা শ্রম অধিকার নিয়ে কাজ করে।

৭. শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ছাড়াও শিল্প, বাণিজ্য, পাট ও বস্ত্রসহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিত্বও নিশ্চিত করতে হবে।

৮. বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ভালো ফলাফল পেতে বিভিন্ন দলের মধ্যে দূরত্ব কমাতে হবে।

৯. আলাপ-আলোচনা তথ্য দ্বারা সমর্থিত হতে হবে।

১০. প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদানের মাধ্যমে কমিটির প্রতিনিধিদের দক্ষতা উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে।

১১. ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার দৃঢ়ভাবে নিশ্চিত করা আবশ্যক, তা না হলে কমিটি গঠন অর্থপূর্ণ হবে না

১২. স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি সমস্যাকে আলাদা করা উচিত, যাতে এটি উপযুক্ত সময়ে একটি সঠিকভাবে পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে পারে।

১৩. যে কোনো সমস্যার সঠিক সমাধান পেতে হলে সুশাসন অপরিহার্য। কাজেই সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে।

১৪. কমিটিতে শিক্ষাবিদদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে হবে।

১৫. কারখানা পর্যায়ে দ্বিপক্ষীয়তা ভুলে যাওয়া উচিত হবে না।

১৬. নারী নেতাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করতে হবে।

১৭. আইনি ব্যবস্থা পর্যালোচনা করতে হবে।

গোলটেবিলে অংশগ্রহণকারীদের তালিকা

নাম	পদবি এবং সংস্থা
মিকাইল শিপার	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব
মো. আমিনুল ইসলাম	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব
খন্দকার মোস্তান হোসেন	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব
মো. রুহুল আমিন	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উপপ্রধান (বস্ত্র)
শ্রীনিবাস বি রেড্ডি	কান্ট্রি ডিরেক্টর, আইএলও, ঢাকা কার্যালয়
ওয়াএল ইসা	জ্যেষ্ঠ কারিগরি উপদেষ্টা , আইএলও
হিউ ইকার্ড	ফার্স্ট সেক্রেটারি, জার্মান দূতাবাস
স্টেন টফট পিটারসেন	কান্ট্রি ডিরেক্টর, থ্রিএফ ডেনমার্ক
ফ্রানজিসকা কম	আবাসিক প্রতিনিধি, এফইএস,বাংলাদেশ
আলোনজো সুসন	কান্ট্রি প্রোগ্রাম ডিরেক্টর, সলিডারিটি সেন্টার
ফারুক হাসান	সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, বিজিএমইএ
মোহাম্মদ হাতেম	সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট বিকেএমইএ
কাজী সাইফুদ্দিন আহমেদ	শ্রমবিষয়ক উপদেষ্টা, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন
রায় রমেশ চন্দ্র	উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য, বিল্‌স
মো. জাফরুল হাসান	যুগ্ম মহাসচিব, বিল্‌স
আলহাজ সুক্কুর মাহমুদ	সভাপতি, জাতীয় শ্রমিক লীগ
আনোয়ার হোসেন	সভাপতি, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল
মো. রফিকুজ্জামান	সভাপতি,বাংলাদেশ জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশন
আমিরুল হক আমিন	সভাপতি, ইন্ডাস্ট্রি অল বাংলাদেশ
চৌধুরী আশিকুল আলম	সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন
আবদুল ওয়াহেদ	সভাপতি, জাতীয় গার্মেন্টস দর্জি শ্রমিক জোট
দেওয়ান মোহাম্মদ আলী	সহসভাপতি, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন সেন্টার
বাবুল আখতার	সভাপতি, বিজিআইডব্লিউএফ
রফিকুল ইসলাম	অর্গানাইজিং সেক্রেটারি, বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশন
মো. আলমগীর রনি	অর্গানাইজিং সেক্রেটারি, জাতীয় শ্রমিক জোট
রোকেয়া রফিক	নির্বাহী পরিচালক, কর্মজীবী নারী
ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম	অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক, সিপিডি
অ্যাডভোকেট একেএম নাসিম	জ্যেষ্ঠ আইনি উপদেষ্টা, সলিডারিটি সেন্টার
মোস্তফা কামাল	নির্বাহী সম্পাদক ও সমন্বয়ক, ইউনিগ্লোবাল ইউনিয়ন
মেহজাবিন আহমেদ	উপদেষ্টা, জিআইজেড
শ্রাবনী নাহার	অ্যাডভোকেট, ঢাকা জজ কোর্ট
শামিমা সুলতানা	প্রকল্প সমন্বয়ক, আওয়াজ ফাউন্ডেশন
উত্তম দাস	শ্রম আইন প্র্যাকটিশনার ও উপদেষ্টা,আইএলও
মো. সাইদুল ইসলাম	কর্মসূচি কর্মকর্তা, আইএলও
সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ	নির্বাহী পরিচালক, বিল্‌স
নাজমা ইয়াসমিন	প্রকল্প সমন্বয়ক, বিল্‌স
অরুন্ধতী রানি	কর্মসূচি সমন্বয়ক, এফইএস

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ - বিল্‌স
বাড়ী নং- ২০, রোড নং- ১১ (নতুন), ৩২ (পুরাতন), ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা- ১২০৯
ফোন: +৮৮-০২-৯১৪৩২৩৬, ৯১২০০১৫, ৯১২৬১৪৫, ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৫৮১৫২৮১০
ইমেইল : bils@citech.net, dwrnbd@gmail.com

ফ্রেডরিক-ইবার্ট-স্টিফটুং (এফইএস)
বাড়ি নং-৮৯ (পশ্চিম), সড়ক নং-৪, ব্লক-বি
বনানী, ঢাকা-১২১৩, বাংলাদেশ